প্রেয়সী ও শ্রেয়সী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
শুভাপ্রসন্ন ভটাচার্য
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

দশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমান সুব্রত আর
শ্রীমতী রঙ্গপ্রিয়াকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

পাঞ্চজন্য
চুনি হল রাঙা
আকাশের সীমা নাই
তৃতীয় রিপু
কলকাতার কাছেই
উপকণ্ঠে
পৌষ ফাগুনের পালা
বহ্নিবন্যা
আমি কান পেতে রই
তিনে একে চার
কথা কল্পনা কাহিনী
পাও নাই পরিচয়
রাত্রির তপস্যা
জন্মেছি এই দেশে
এক প্রহরের খেলা
রানী কাহিনী
একদা কী করিয়া
তব দক্ষিণপাণি
রজনীগন্ধ্যা
আবছায়া
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম
নারী ও নিয়তি
মালাচন্দন
কেতকী বন
নববধূ
মিলনান্ত
কুবেরের অভিশাপ
সমুদ্রের চূড়া
গল্প-পঞ্চাশৎ
আকাশলিপি
পূর্বপুরুষ
স্মরণীয় দিন
কঠিন মায়া
সুপ্তি-সাগর
দুটি
পুরুষ ও রমণী

আকাশের আয়না
জলে দেখি জোনাকি
সাধুসঙ্গ
সুখে থাকার কাল
হায়নার দাঁত
তারা ভৈরবী
তবু মনে রেখো
স্বর্ণমৃগ
স্বপ্ন আমার জোনাকি
জ্যোতিষ্ক
মনে ছিল আশা
আসা যাওয়ার পথের ধারে
দহন ও দীপ্তি
ভাড়াটে বাড়ী
যোগাযোগ
জীবন স্বপ্ন
প্রেরণা
কমা ও সেমি কোলন
সমারোহ
রাত্রির সীমানা
জায়া নয় দয়িতা
হে নিরুপমা
রক্তকমল
বাহির বিশ্ব
কোলাহল,
স্বপ্ন-সন্ধ্যা
চাঁদমালা
শ্রেষ্ঠ গল্প
তিন সঙ্গিনী
নীলকণ্ঠী
নবজন্ম
বিজয়িনী
দেহ-দেউল
কিশোর গ্রন্থাবলী
রূপ তরঙ্গিমা
সোহাগপুরা
একাল চিরকাল

অনেক ঘুরেছে মুকুট। তীর্থ প্রায় কোনটাই বাদ নেই, হিমালয়ের গন্তব্য-স্থান—মানে যা যা দেখবার আছে ; অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী, ক্ষীরভবানী এ সব তো আজকাল সবাই যায় ; কেদার বদরী তুঙ্গনাথ বলতে গেলে ভাত-জল হয়ে গেছে ; মণিমহেশ, পঞ্চকেদার, পশুপতিনাথ ইত্যাদি যা যা নাম শুনেছে বা মনে পড়েছে—সে সব তো বোধহয় শেষ হয়ে গেছে ; মায় গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী পর্যন্ত দেখে এসেছে। শুধু যাওয়া হয়নি কৈলাস ও মানস-সরোবর—এখন যাওয়ার উপায় নেই বলেই যেতে পারেনি।

মুকুট বা মুকুটলাল—ঠাকুর্দা আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন, তিনি মীরাটে চাকরি করতেন—সেখানেই বাস করেছেন তারপরও—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিখ্যাত আসামী কিশোরীলালের সঙ্গে একটা গোপন সখ্য ছিল, লাল পছন্দ হওয়ার সেও বোধহয় একটা কারণ—নামের শেষে লাল ভারি পছন্দ ছিল তাঁর, আসলে বেরিয়েছিল গুরু খুঁজতে।

কী চায় সে, কেমন গুরু পছন্দ তা সে জানত না, আজও জানে না··· শুধু এইটে মনে ছিল যে যাঁকে দেখে শ্রদ্ধা হবে, মনে হবে ইনি ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন, তাঁকেই গুরু করবে সে।

তিনি যদি দীক্ষা না দেন ?

কেউ কেউ সে প্রশ্ন করেছে বৈকি।

তার উত্তরে মুকুট বলেছে, 'না দেন পা ধরে পড়ে থাকব, গালাগাল দেন সেইটেই মন্ত্র বলে জপ করব। শোনেন নি কবীরের কথা? রামানন্দ নাকি মুসলমান বলে দীক্ষা দিতে চান-নি, অনেক কাকুতি-মিনতিতেও নাকি মন্ত্র দেননি। শেষে কবীর এক ফন্দী আঁটলেন। রামানন্দ রাত তৃতীয় প্রহরে কাশীর মণিকর্ণিকায় স্নান করতে যেতেন—সেইখানে গিয়ে এক-

দিন ঘাটে নামবার পথে সিঁড়িতে শুয়ে রইলেন। রামানন্দ অন্ধকারে দেখতে পান নি, আশা বা আশঙ্কাও করেন নি তো—নামতে গিয়ে গায়ে পা দিয়েছেন আর মড়া মনে ক'রে 'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করেছেন। ব্যস, কবীরের কাজ ফতে— উঠে ওঁকে প্রণাম ক'রে বললেন, আমার ইষ্ট-মন্ত্র আমি পেয়ে গেছি, আর কিছু চাই না। সেই থেকে রাম নাম জপ করেই সিদ্ধিলাভ করলেন

কিন্তু তেমন ভাগ্য মুকুটের হয় নি।

ঐ কবীরের নামাঙ্কিত মঠ, কবীর চৌরায়, সেখানেও গিয়েছিল। সেখানের মোহান্তকে দেখে, কথা বলে শ্রদ্ধাও হয়েছে, কিন্তু তবু এঁরা আধা মুসলমান আধা হিন্দু, এঁদের আশ্রমে থাকলে আলাদা কথা—গৃহী হিসেবে দীক্ষা নিতে মন সরে নি।

মোহান্তও উৎসাহ দেন নি তেমন।

কাশীর অন্য দু একটি আশ্রমেও গেছে সে।

আগেকার যে সব বিখ্যাত সাধু কেউ নেই।

দু একজন যা আছেন নাম শুনে গিয়ে পায়ে পড়ার চেষ্টা করেছে – তাঁরা পাত্তা দেন নি।

কামরূপ মঠের মোহান্তকে ধরেছিল, তিনি বলেছেন, এভাবে গৃহস্থকে দীক্ষা আমরা দিই না।

এছাড়া অন্য অন্য জায়গায় গুরুই পছন্দ হয় নি সেরকম, যার কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে প্রাণপাত করবে।

শুনেছিল কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে উচ্চকোটির সাধুরা রাত দুটো-আড়াই-টেয় স্নান করতে আসেন।

মনে হয়েছিল একবার কবীরের মতো কারও পায়ে গিয়ে পড়বে নাকি? কিন্তু কাউকেই চেনে না, কার পায়ে পড়বে?

পরে যদি গুরু পছন্দ না হয়? গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা এলে সাধন ভজন সবই মাটি।

না, দীক্ষা কি সন্ন্যাস নিতে গেলে দেখে শুনে বাজিয়ে নেওয়াই উচিত।

ান্যাসী অনেক দেখেছে বৈকি!

ড় বড়, নামকরা সন্ন্যাসী, বহু শিষ্য সামন্ত --অগণিত ভক্ত, তাদের ভিড় ঠলে ভেতরে ঢোকাই যায় না।

এ গুরু নিয়ে সে কি করবে?

মহাপুরুষ হতে পারেন—সিদ্ধ সাধকও—কিন্তু দীক্ষা দেবার দুদিন পরে যিনি আর চিনতে পারবেন না, শিষ্যর আর্তি শোনার যাঁর অবসর নেই, যিনি দীক্ষামাত্র দেবেন-- শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের ভার নিতে পারবেন না, তাকে সাধনার পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করবেন না?

এসব ফ্যাশনেবল সাধু ধনবান বা বড় বড় ডাক্তার ব্যারিস্টারের শোভা পায়।

তাঁদের কাছে এটাও একটা 'স্ট্যাটাস সিম্বল'।

এছাড়া কৌপীনবস্ত্র বা উলঙ্গ সাধু—জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিত, তাঁদের কেউ বা ভীমকান্তি, কেউ বা সৌম্যকান্তি—সবরকমই দেখেছে। তাঁদের সাধনা বা তপস্যায় হয়ত কোনো ভেজাল নেই কিন্তু দেখেছে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা, অগ্রাধিকার নিয়ে সম্মান নিয়ে কুৎসিত কদর্য কলহ তর্ক করতে।

এমন কি মারামারি রক্তপাতও।

মন ভরে নি · চলে এসেছে সেখান থেকে।

এতকাল পরে—এই জনবহুল, অর্থলোভী-নকল-সন্ন্যাসী ও মিথ্যাচারী মানুষে পূর্ণ--হরিদ্বারে এসে ওর মন নাড়া পেয়েছে।

মনে হয়েছে—পেয়েছে তাঁকে, যাঁকে এতকাল ধরে খুঁজে বেড়িয়েছে। বলতে গেলে হাতের কাছেই ছিল। কিন্তু এখানে খোঁজবার কথা মনেই পড়ে নি।

কনখলে আনন্দময়ী মার প্রাসাদোপম আশ্রম দেখতে গিয়েছিল এক-দিন।

সেখানে বাড়ি-ঘর লোকজন সব ছিল, কিন্তু মা ছিলেন না বলে ভালো লাগে নি—বেরিয়ে একা এসে গঙ্গার ধারে বসে ছিল।

না দক্ষঘাট নয়—পাশে অখ্যাত একটা ঘাট, জনবিরল, শান্ত, নিস্তব্ধ।

জনবিরল কিন্তু একেবারে যে জনহীন নয়, সেটা বুঝল অনেকক্ষণ বাদে।

আগে লক্ষ্যই হয় নি, ঐ ঘাটেরই এক প্রান্তে একটা সিঁড়ির ওপর একেবারে জলের ধারে আর একটি মানুষ বসে ছিলেন।

আসলে তখন হেমন্তের সন্ধ্যা ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে বলেই আগে চোখে পড়ে নি।

তাছাড়া ওর দৃষ্টি ছিল দূরে, ওপারে নীলধারা চণ্ডীর পাহাড়ের দিকেই।

আর এ লোকটিও বসেছিলেন শুধু নীরব নয়—নিস্পন্দ হয়ে।

চোখ যে পড়ল ওঁর দিকে, সেটাও এক নাটকীয় কারণে।

ওর মনে হলো এটাও দৈবেরই যোগাযোগ।

ক্রমশ ওদিকটাও আবছা হয়ে এসেছে।

অন্ধকার একেবারে নিরন্ধ্র না হলেও বেশ ঘন।

হঠাৎ সেখানে সামান্য কোনো আলো দেখা দিলেও চমক লাগে, আর এতক্ষণের অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায় অপর্যাপ্ত, ক্ষীণ আলোতেও।

ফুলের মধ্যে বসানো একটা আলো জলে ভেসে যাচ্ছিল।

এখানে গঙ্গাতে এই ফুল ও প্রদীপ ভাসানো পুণ্য-কর্ম। নিত্যই বহু প্রদীপ এইভাবে ভেসে যায়।

ওর অনায়াসেই চোখ পড়েছে ভেসে যাওয়া পুষ্পপুটের মধ্যে বসানো ছুটি প্রদীপ শিখার দিকে, আর তারই ক্ষীণ আলোতে ছায়ামূর্তিটা দেখা গেছে—মোটামুটি তার অবয়ব ও বেশভূষাও।

তারপর আলো চলে গেলেও, দৃষ্টি আবার এই আবছায়াতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে আবারও ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখেছে এবং দেখতে পেয়েছে।

লোকটি যতদূর দেখা গেল—প্রচলিত অর্থে যাকে বলি সাধু বা পরিব্রাজক। মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, তার কিছুটা হয়তো জটাবদ্ধ—এতদূর থেকে দেখে কিছু নিশ্চিত বোঝা গেল না—পরনে গেরুয়া কাপড়, জামা নেই, একটা উড়নির মতো আছে—সেটা কোমরে জড়ানো।

সঙ্গে কিছু নেই—অন্তত দেখা যায় না—একটা কমণ্ডলু বা জলপাত্রও না।

লোকটি তখনও তেমনি স্থির। এত স্থির যে মনে হয় বুঝি নিশ্বাসও পড়ছে না।

সামনে নীলধারা বা তার ওপারের উপলাস্তীর্ণ রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ—হয়ত বা পলকহীন চোখেই চেয়ে আছেন।

ভক্তি মানুষের কখন কার ওপর আসবে তার কোনো হিসেব নেই।

তা মুকুটও জানত। কিন্তু ওর মনে যে ভাবটা এমন অকস্মাৎ ও অকারণে আসবে তা ভাবে নি।

লোকটাকে দেখতেও পায় নি এখনও ভালো ক'রে, মুখখানা পর্যন্ত না।

কী জাত—মানে কোথাকার শরীর, বাঙালী না পাঞ্জাবী না হিন্দুস্থানী—কত বয়স কোন্ মার্গ—কিছুই জানেনি এখনও।

কোনো সম্প্রদায়ে দীক্ষিত সাধু না এমনি গৈরিকধারী—তাও এখনও জানতে পারে নি—তবু ওর মনে হলো, এই এঁর জন্যেই এতকাল ও অপেক্ষা করছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে রইলেন সাধুটি।

তেমনি ভাবেই।

পাথরের মতো স্থির নিশ্চল হয়ে।

তাঁর কাছে যেতে বা এই ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছা কি সাহস হলো না মুকুটের, সেও তেমনিই বসে রইল।

আরও কতক্ষণ সেভাবে বসে থাকতে হ'ত কে জানে, হঠাৎ ঘাটের পাশে দু-তিনটি কুকুর খুব কর্কশ কণ্ঠে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি শুরু করতে যেন চমকে উঠেই ঘোরটা ভাঙল ওঁর।

একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বোধহয় পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

তারপর হাত বাড়িয়ে খানিকটা গঙ্গাজল নিয়ে কপালে মাথায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এইবার মুকুটও উঠে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে সেই সিঁড়ির ধাপের ধুলোর ওপরই হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করল।

'শিব! শিব!', অস্ফুটকণ্ঠে বলে থমকে দাঁড়ালেন সাধুটি।

তবে সে ক্ষণেকমাত্র, তারপরই পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেন আবার।

কিন্তু মুকুট তাঁকে সে সুযোগ দিলো না, ওঁর সঙ্গেই পিছিয়ে যাবার মতো হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'আমার একটা আরজি আছে মহারাজ—একঠো ভিক্ষা—'

হিন্দীতে বলবে না বাংলায়—সেটা বুঝতে না পেরে দু'রকমই বললো।

উনি ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে হলেও পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'এখন না বাবা, কিছু বলতে হয় কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রো—'

'কিন্তু কোথায় আপনার দর্শন পাবো মহারাজ? আপনার ডেরাটা কোথায় যদি বলতেন—'

মুকুট উৎসুকভাবে প্রশ্ন করে।

একটু কি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন সাধু?

অন্তত মুহূর্ত কয়েক নীরব রইলেন এটা ঠিক।

তারপর মনে হলো যেন হাসলেনও একটু।

কৌতুকের হাসি?

তাও বুঝল না মুকুট।

কিন্তু কথা বলার সময় সে ধরনের কোনো ভাবই, দ্বিধা বা কৌতুক কিছু ফুটল না।

এতক্ষণে শান্ত মৃদুকণ্ঠেই বললেন, 'ডেরা? ডেরা তো আমার নেই। ঐ ওপারে গঙ্গার ধারেই কোথাও একটা বসে থাকি—কখনও জলের মধ্যে-কার কোনো পাথরে, কখনও বা পাড়ে—ওপারে গিয়ে চেয়ে দেখো, ঠিক দেখতে পাবে।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না।

একটু এগিয়ে গিয়ে পাথর-বালি ফেলা যে পুলের মতো রাস্তাটা গেছে

নীলধারা পার হয়ে চণ্ডীর পাহাড়ের দিকে, সেই পথ ধরলেন।

প্রথমটা বাড়ি মন্দিরগুলো আড়াল পড়ায় দেখতে পায় নি মুকুট—কিন্তু খানিকটা পরেই সেই আবছা আলোতেই চোখে পড়ল পুলের পাশ ধরে জলের উপর দিয়েই দ্রুতপদে হাঁটছেন সন্ন্যাসী।

মিনিট তিনেক পরে আর দেখা গেল না, ওপারের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

সন্ন্যাসী মিথ্যা আশ্বাস দেন নি। পরের দিন নীলধারা পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতেই মুকুট দেখতে পেল ওঁকে। সামনেই একটা পাথরের ওপর পূর্বদিনের মতো স্তব্ধ স্থির হয়ে বসে আছেন, পলকও যেন পড়ছে না চোখে।

সেই শান্ত ধ্যানমগ্ন মুখের দিকে চেয়ে আরও উৎসাহিত হলো সে। না, কাল অন্ধকারে আবছা আলোতেও ভুল হয় নি তার, এই—এই-ই তার গুরু, এঁর জন্যই সে এতকাল দেশে দেশে ঘুরেছে।

এঁর মধ্যেই সাধনার সে অতলতা আছে, আছে ঐহিক জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণ নিরাসক্তি—যা এতকাল খুঁজে বেড়িয়েছে মুকুট।

এই শান্তি কোথা থেকে আসে সে সম্বন্ধেও নানা বই পড়ে, নানা লোকের সঙ্গ ক'রে—একটু জ্ঞান হয়েছে বৈকি।

এ আসে অন্তরের অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি থেকে।

যে আনন্দ ব্রহ্মাস্বাদ ছাড়া সম্ভব নয়।

ব্রহ্মবিদ কিনা তা জানে না, সেখানে পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধেও ওর কোনো ধারণা নেই, অত বড় কথা চিন্তা করার অবশ্যই এখনও সময় আসে নি, তবে সেদিকে যাত্রার পথটা নিশ্চয়ই দেখাতে পারবেন উনি।

এটুকু বোঝবার মতো শক্তি বা অভিজ্ঞতা হয়েছে বৈকি মুকুটের।

এটা অহঙ্কারের কথা নয়।

অনেক বই পড়েছে সে এসম্বন্ধে। অনেক তপস্বী মহাতপস্বীর জীবনী,

তাঁদের উপদেশ নির্দেশ।

দেখেওছে অনেক।

এ সিদ্ধান্ত সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—তাই মুকুটের এতটা আত্মবিশ্বাস এ বিষয়ে।

অন্তরের আবেগ চাপতে না পেরে সে অবশিষ্ট পথটুকু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওঁর সামনে পাথরে মাথা রেখে প্রণাম করল।

সাধু ওর দিকে তাকালেন না, মুখও ফেরালেন না, কিন্তু সম্ভবত পায়ের শব্দেই ওর উপস্থিতি বুঝে বললেন, 'বসো ঐখানটায়।'

আঙুল তুলে সামনের বড় পাথরটা দেখিয়ে দিলেন।

আরও দশ মিনিটকাল সেইভাবে বসে থেকে ওর দিকে ফিরলেন সাধু। মুকুটের মনে হলো চোখে পলক পড়ে নি এতক্ষণের মধ্যে, এখন ওর দিকে ফিরতে প্রথম পড়ল।

একবার—এক নিমেষের জন্যে মনে হলো কোনো ছদ্মবেশী দেবতা কেউ নয়ত? তাঁদের নাকি ছায়া পড়ে না, পলক পড়ে না।...তারপরই মনে হলো সাধকরা সবই পারেন, পলক না পড়লেও তাঁদের কোনো ক্ষতি হয় না, স্নায়ু বশ করা তো তুচ্ছ কথা—ধমনীর রক্তস্রোতকেও কিছুকাল স্থির রাখা নাকি অসম্ভব নয়।

সমাধিস্থ অবস্থায় তা নাকি রাখেনও অনেকে।

'বলো বাবা, কী বলতে চাইছিলে কাল।'

'আমি—আমি মহারাজ দীক্ষা নিতে চাই আপনার কাছে।'

'কেন?'

সংক্ষিপ্ততম সরল প্রশ্ন—কিন্তু মুকুটের মনে হলো বড় জটিল।

'এই—এই মানে সাধন ভজন—ভগবানকে ডাকতে চাই।'

'তা আমার কাছে কেন? গৃহীর জন্যে গৃহস্থ গুরুই তো প্রশস্ত।'

'আপনি আমাকে তাহলে সন্ন্যাসই দিন।' ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে মুকুট। গলায় বেশ একটু জোর দিয়েই বলে।

হাসলেন সাধু। বললেন, 'সন্ন্যাসের সময় এখনও আসে নি বাবা তোমার।

সংসারে ফিরতে হবে।'

'না না—সত্যি বলছি আপনাকে, সংসারেতে দিকদারী আমার ধরে গেছে আমার—'

'সংসারে মোহ আছে বলেই যে আঘাত খেয়েছ তাই এত লেগেছে। নইলে এমন পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়তে না। যার কিছু নেই, কোনো আসক্তি নেই—তার কোনো ক্ষতিবোধও থাকে না, আঘাত পাবার কারণ ঘটে না।...মনে হচ্ছে স্ত্রীর কাছ থেকেই আঘাত পেয়েছ—তাই না? কিন্তু এক স্ত্রী যদি হতাশ ক'রে থাকেন অন্য স্ত্রীও যে তাই করবেন তা ভাবছ কেন?...আর ভাবলেও কোনো লাভ হবে না। তোমাকে আবার সংসার করতেই হবে বাবা।'

আবার সংসার!

মুকুটের যেন বুকের মধ্যেটা হিম হিম বোধহয়। সত্যি সত্যিই আতঙ্ক বোধ-হয় তার।

'সংসার!' অনেকক্ষণ পরে একটা যেন কান্নার সুর বেরোয় তার গলা দিয়ে, 'এ থেকে কি কোনো অব্যাহতি নেই? আমার যে একেবারে ঘেন্না হয়ে গেছে বাবা। আমাকে মুক্তি দিন। আপনি সিদ্ধ পুরুষ, আপনি সব পারেন।'

'যে সংসার তোমাকে এই তিক্ততা দিয়েছে সেই সংসারই হয়তো এবার অমৃতের পাত্র নিয়ে আসছে—কে জানে। আর সে যাই হোক, এ তোমার ভাগ্যলিপি—কেউ খণ্ডন করতে পারবে না।'

'কেউ পারবে না। আমি যদি আত্মহত্যা করি?' পাগলের মতো উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটোয় যেন হিংস্র প্রতিশোধের আলো জ্বলে ওঠে মুকুটলালের।

'মরার চেষ্টা করতে পারো। মরবে না। তোমার কর্ম এখনও শেষ হয় নি, সংসারের দেনা-পাওনা মেটে নি।'

'আমি যদি চল্লিশটা স্লিপিং পিল খাই?'

'বেশ তো। খেয়ে দ্যাখো না।' সাধু হাসেন। বলেন, 'ঐ তো সামনেই গভীর পাহাড়, ওপরে উঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমি এখানেই বসে

আছি।'

মুকুটলাল যেন চুপ্‌সে যায় কি রকম।

না, এসব কথার কথা। ঐ উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবে না সে। তার চেয়ে স্লিপিং পিল খাওয়া ঢের সোজা।

কিন্তু তাই কি পারবে?

সময় উপস্থিত হলে হয়ত পিছিয়ে আসবে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল সে।

সাধুও স্থির হয়েই বসে রইলেন।

এবার দৃষ্টি দূর শূন্যে নিবদ্ধ নয়—ওঁর মুখের ওপরই স্থির হয়ে আছে। তবে তাড়াও দেন না উত্তরের জন্যে। মনে হয় সময় আর ধৈর্যের শেষ নেই তাঁর।

কোনো কাজ নেই বলেই কি? সময়ের অভাব নেই। তাড়াও নেই তাই। না কি ওঁর যে জীবন যে চিন্তা—যে সাধনা, তাতে জাগতিক সময়ের কোনো মূল্য নেই?

অনন্ত অনাদি ব্রহ্ম যার লক্ষ্য, যার প্রিয়, প্রিয়তম—তাকে সময়ের সীমা বাঁধবে কেমন করে?

কথা তাই মুকুটকেই বলতে হলো আবার। বললো, ঈষৎ যেন ভাঙা গলায়—পরাজিত, ভীত, অপমানিত লোকের মতোই—'ত. সে সংসার কবে হবে বাবা, কি ক'রে, কোথায়—?'

প্রশ্নটা অসমাপ্ত রেখে উৎসুকভাবে চায় ওঁর দিকে।

সাধু বলেন, 'এ যখন তোমার অনিবার্য তখন তুমি ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন! সংসারই তোমার কাছে এগিয়ে আসবে। যে জায়গা তোমার ভালো লাগে সেইখানে গিয়ে কিছুদিন থাকো। স্থির হয়ে। মন থেকে অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠা দূর করো। ভগবানকে ডাকতে চাও, বেশ তো, কোথাও বসে তাঁকেই ভাবার চেষ্টা করো না। ছাখো না, তাঁর করুণা কোন্ পথে কোন্ রূপ ধরে আসে।'

এ আবার কি রকম কথাবার্তা।

এ তো সবই কেমন হেঁয়ালি-হেঁয়ালি ব্যাপার।

সাধুর ওপর ভক্তি হয়েছে ঠিকই, সে ভক্তি এখনও যাবার কোনো কারণ ঘটে নি—তবে এঁর মনের আর কথার যেন কোনো তল পাচ্ছে না মুকুট।

কি ভাবে কথাটা বলছেন—ঠাট্টা করছেন না তো?

না কি তার—এই ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, আশা-আশঙ্কা সবটাকেই উপহাস করছেন, মজা দেখছেন।

সাধু খুব ধীরে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'যে অশান্তি ভোগ করছ—এ সমস্তই কি তোমার নিজের কৃতকর্মের ফল নয়? নিজের হাতে পোঁতা—বিষবৃক্ষ বলব না—ভাগ্যের গাছে ফল ধরেছে, তুমি ছাড়া সে আর কে আস্বাদ করবে বলো!'

প্রচণ্ড রকম চমকে ওঠে মুকুট।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার।

এ-সব কথা উনি জানলেন কি ক'রে?

এ তো অন্তর্যামীর মতো বলছেন উনি।

আর, এই মুহূর্তে ওঁকেই সন্দেহ করছিল সে।

ছিঃ ছিঃ।

কি নির্বোধ সে।

এর চেয়ে বড় রকম কোনো চড় খাওয়ার কথা যে ভাবাই যায় না।

সঙ্গে সঙ্গেই আবেগ বুঝি উত্তাল হয়ে ওঠে।

'বাবা!' বলে উঠে সে সেই পাথরের নুড়িগুলোর ওপরই ওঁর সামনে পড়ে।

আছড়ে পড়ার মতো ক'রেই প্রায়।

নিতান্ত আঁকাবাঁকা অসংলগ্ন বড় বড় গোল পাথর বলেই সেভাবে সাষ্টাঙ্গে পড়া সম্ভব হলো না।

সাধু কিন্তু আর ওকে কোনো কৃপা করলেন না। কিছুই বললেন না আর। সেই কালকের মতো অস্ফুট কণ্ঠে 'শিব' 'শিব' উচ্চারণ ক'রে নিমেষের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে ত্বরিত গতিতে গঙ্গায় নেমে গেলেন এবং সেই খরস্রোতের মধ্যে দিয়ে স্রোতের পথেই দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

২

হ্যাঁ, মুকুটেরই কৃতকর্মের ফল, তাতে সন্দেহ নেই।

বরং দুর্বুদ্ধির ফল বলা উচিত।

মানুষের অদৃষ্ট মন্দ হ'লে আগে তার বুদ্ধি নাশ হয়—ছেলেবেলায় অঘোর পণ্ডিতমশাই বলতেন, কথাটা খাঁটি সত্য।

মুকুট অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হলেও 'বকে' যায় নি, ভালোভাবেই লেখা-পড়া করেছিল।

এম. এসসি-তে ফার্স্ট হয়ে রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছিল।

সে রিসার্চের ফলে শুধু যে এখানের ডি. এসসি. হয়েছে তাই নয়, বিড়লার ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে বিলেতেও গেছে, নামের পাশে অতিরিক্ত কটা অক্ষর বা উপাধি যোগ ক'রে ফিরেছে।

এরপর এদেশে এসে চাকরির অভাব হবে না, সে তো জানা কথাই।

প্রথমে উঁচু দরের অধ্যাপকের চাকরি, পরে ভারত সরকাবের এক ধরনের উপদেষ্টার পদ।

হাজার দুই টাকা মাইনে ও বিবিধ ভাতা। সেও দিনে দিনে বেড়েছে।

এর মধ্যে ওর বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছিলেন, গরজ ক'রে বিয়ে দেবার লোক ছিল না বলেই এমন পাত্রর বিয়ে হয় নি এতদিন।

এইবার সে নিজেই বিয়ে করল।

হাওয়া খেতে নয়, সরকারী কাজেই দার্জিলিং গিছল, সেখানেই রুমা সেনের সঙ্গে আলাপ।

রুমা সদ্য ডাক্তারী পাস করেছে, তারপর ক মাস ইন্টার্নি হিসেবে যা থাকার তাও থাকা হয়ে গেছে।

ভালো চাকরি পেলে করবে, কিংবা প্র্যাক্টিশ। ওর বাবার কিন্তু লক্ষ্য

ছিল ভালো পাত্র ধরে বিয়ে দেবারই।

হয়ত সেই কারণেই এই ভরা সিজন-এ দার্জিলিং আসা তাঁর।

আলাপের সংঘটনটাও সম্ভবত পরিকল্পিতভাবে আকস্মিক।

যোগাযোগ সৃষ্টি ক'রে নেওয়া—ভেবে চিন্তে, হিসেব ক'রে।

মুকুটের চেহারা দেখে ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে মেয়ের বাবারা চঞ্চল হয়ে উঠবেন, এ স্বাভাবিক।

মুকুটের তরফ থেকেও আপত্তির কোনো কারণ ছিল না, বরং রুমাকে দেখার পর ও তার পরিচয় জেনে আগ্রহই দেখা দিয়েছিল।

রুমাকে সুশ্রী বললে কম বলা হয়, অথচ সুন্দরী বললেও অতিশয়োক্তি হয় একটু—এমনি চেহারা।

তবে রূপে যে অসাধারণত্বর খামতি সেটা শ্রীতে পূরণ হয়েছিল, দেখলেই পুরুষের মন আকৃষ্ট হতো।

মুকুট বলত, 'তোমার সেক্স্-অ্যাপীল দুর্দান্ত। পুরুষ বন্ধুদের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে কি ক'রে ? কোনো একটি সহপাঠীকেই তো এতদিন বিয়ে ক'রে ফেলার কথা।'

রুমা হাসত। বলত, 'ক্যাণ্ডিডেট অনেক বলেই কেউ একজন সুবিধে করতে পারে নি। কেউ একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেই সুন্দ-উপসুন্দর লড়াই বেধে যেত। আর ওদের হ্যাংলামি দেখে আমারও ঐ প্রণয় ব্যাপার-টাতেই অরুচি ধরে গিছল। আর তুমি যাকে সেক্স্-অ্যাপীল বলছ, তার মূলে তো ঐ সেক্স্ ছাড়া কিছু নেই। ওর মধ্যে প্রেম কোথায় যে ধরা দেব!'

নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল দু' মাসের মধ্যেই।

মুকুটের আপন বলতে কলকাতায় ছিল এক খুড়তুতো পিসীমা, তাঁরও বয়স হয়েছে. 'হামরাই' হয়ে বিয়ে দেবেন সে সামর্থ ছিল না।

সুতরাং রুমার বাড়ি থেকেই বিয়ের কাজটা হলো, আগে রেজিস্ট্রী পরে, আনুষ্ঠানিক বিয়ে।

এটায় মুকুটের তত সায় ছিল না, কিন্তু রুমার লোভ ছিল কনে সাজার ও সাত পাক দেওয়ার।

সে নাকি ছোটবেলা থেকেই টোপর পরার স্বপ্ন দেখে এসেছে।

ওখানেই ফুলশয্যা সেরে, মুকুট নিজের পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠল।

বাড়ির সবটাই প্রায় ভাড়া দেওয়া ছিল, কেবল দোতলার একটি ছোট ফ্ল্যাট রেখেছিল নিজের জন্যে।

তাতে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া আসবাব ধরবে না, রুমাও নিজের মনের মতো ক'রে ফ্ল্যাট সাজাতে পারবে না বলে দু'পক্ষই ভালো একটা ফ্ল্যাট খুঁজছে—এমন সময় মুকুট একটা আরও অনেক ভালো চাকরি পেয়ে গেল।

বড় একটা সওদাগরী ফার্মের কাজ, চার হাজার টাকার মতো মাইনে, উপমাইনেও সব জড়িয়ে হাজার দেড়েকের কম নয়, সঙ্গে ভালো ফ্ল্যাট একটা।

মুকুট দিল্লীতে চলে এলো স্ত্রীকে নিয়ে।

অতঃপর সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে—তার কারণ দু'জনের কারও তরফেই প্রেমপ্রীতির অভাব ছিল না—জীবন কেটে যাবার কথা।

কাটছিলও, কিন্তু তাইতেই বোধহয় ভাগ্যের চোখ টাটাল, দুর্বুদ্ধি জাগল মুকুটের।

হয়ত আশপাশের বড় বড় পাঞ্জাবী অফিসারদের দেখেই কথাটা মনে এসেছিল।

এঁদের স্ত্রীরা প্রায় সকলেই বড় বড় চাকরি করেন, কোনো অভাব বা কারণ না থাকা সত্ত্বেও।

দু' একজনের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছিল।

তারা বল্লে, 'কি হবে, ঘরে বসে বসে শুধু ঘুমিয়ে মোটা হয়ে যাবে, যখন সুযোগ আছে কাজ করুক না!'

মুকুট রুমাকে বললো, 'না না, এ কোনো কাজের কথা নয়। এত কাণ্ড ক'রে বিদ্যেটা শিখলে, ভালোভাবে পাস করেছ মেডেল স্কলারশিপ পেয়ে—

হয় এম. ডি-টা দাও নয়তো কোথাও একটা কাজে লেগে যাও। বাড়িতে কোনো কাজই নেই, যমুনা দাই আছে, প্রেম সিং রাঁধে ভালো—তুমি শুধু চুপ ক'রে ঘরে বসে থেকে কি করবে ? ঘুমিয়ে অমন ফিগারটা মাটি করবে বৈ তো নয়।'

রুমা বললো, 'আমি তো বলি প্রেম সিংকে ছাড়িয়ে দিতে। তোমার জন্যে রাঁধব, তোমাকে নিজের হাতে রান্না ক'রে খাওয়াবো এ শুধু আমার শখ নয়—স্বপ্নও। যখন তোমাকে দেখিনি তখনও স্বপ্ন দেখেছি স্বামীকে রেঁধে খাওয়াচ্ছি। সেইজন্যে যা মার কাছ থেকে কত পিঠেপুলি, কেক করা শিখেছি !'

এতে যে কোনো স্বামীরই বিগলিত হবার কথা।

মুগ্ধ, অভিভূত, কৃতার্থ। স্ত্রীর এ ধরনের ভালবাসা এ যদি অমৃত না হয় তো অমৃতেরই বা কি মূল্য।

কিন্তু যে না চাইতে অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য পায় সে বুঝি তার মূল্য বোঝে না।

মুকুটও বুঝল না, সে বললো, 'সে তো করছই। সন্দেশ, রসগোল্লা সবই তো করছ। তাই বলে এভরি-ডে-রান্নার ড্রাজারী তোমার ওপর চাপাতে রাজী নই। ওর মধ্যে এমন কি আছে—যাতে তুমি একসেল করবে। এসব শৌখিন রান্না প্র্যাকটিশ ক'রে হয়ত করা যায় না—কিন্তু চাকরি ক'রে করা যায়। আর বাড়িতে একটা পুরুষ সার্ভেন্ট থাকা ভালো—অবশ্য বিশ্বাসী হওয়া চাই। তা প্রেম সিং তো জানাশুনো, বাহেল সাহেবের ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি আট বছর ছিল, ওরা তো বলে দু-চার পয়সা বাজার থেকে সরায় কিনা জানি না—তবে চোর ডাকাত নয়। সেইজন্যেই ওকে ছাড়তে চাই না।'

রুমা তবুও আপত্তি তুললো, 'চাকরিই যদি করি-- তোমার ভাষায় এত কাণ্ড এত কষ্ট ক'রে—বিদ্যেটা শেখার সার্থকতা কি রইল ?'

মুকুট উত্তর দিলো, 'চাকরি কি কেরানীর চাকরি। তোমার লাইনের ভালো চাকরি পেলে করবে। প্র্যাকটিশ করতে গেলে যদি জমে যায় আমি বেচারী তোমার নাগালই পাব না।'

এমন দৃষ্টান্তও মুকুটের জানা ছিল।

বিশ্বজিৎ গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক।

স্ত্রী কৃতী ব্যবহারজীবী,বিহারে প্র্যাকটিশ করেন,বিশ্বজিৎবাবু মোটা মাইনের চাকরি করেন কলকাতায়।

সপ্তাহে একদিন মাত্র দেখা হয়, ছুশো টাকার ওপর খরচ ক'রে সে দেখা করতে হয়।

আসল কারণটা রুমা কিছুতেই বলতে পারল না, একটা কেমন সেই প্রাগৈতিহাসিক ছুর্নিবার লজ্জা এসে যেন কণ্ঠরোধ ক'রে ধরল – সে ছেলে-মেয়ে চায়, স্বামী-পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার করতে চায়। ডাক্তারী পড়তে গিছল বাবার সাধ আর শখ বলে—নইলে সে মনে-প্রাণেই বাঙালী সংসার-ভালবাসা মেয়ে।

বলতে পারল না তার আরও কারণ, সে স্বামীর মনের কথাটা জানে। মুকুটের ইচ্ছে নয় এত শিগগির ছেলেপুলে হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়ে সে।

তার আশঙ্কা সন্তান হলেই রুমার এই ফিগারটা নষ্ট হয়ে যাবে, গ্ল্যামারটা থাকবে না।

তার রূপ বা শ্রী সম্বন্ধে স্বামীর এই পুজো করার মতো মুগ্ধতা ও আসক্তিরও একটা মোহ আছে, সেটাও রুমা কম উপভোগ করে না—সেইজন্যেই আরও এ ব্যাপারে জোর করতে পারে না।

উদ্যমী মুকুটলাল অবশেষে ভারত সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে একটা চাকরি ঠিক ক'রে ফেলে রুমার জন্যে।

বিনা পরীক্ষায়, বিনা আবেদনপত্রেই কাজ পেয়ে যায় সে—শুধু পাবলিক সার্ভিস কমিশনে লোক দেখানো একটা ইন্টারভিউ হয়।

অবশ্য লোক দেখানো না হলেও ক্ষতি ছিল না—বিদ্যা আর বুদ্ধি ছুটোই পর্যাপ্ত ছিল রুমার।

চাকরিতে ঢোকার পর উন্নতি হতেও দেরি হয় না।

বরং মনে হয় এক এক সময়, সমস্ত নিয়ম ও আইন ডিঙিয়েই ওকে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে।

বছর দুইয়ের মধ্যেই সে ডেপুটি ডিরেক্টারের পদ পেয়ে যায়।

মন্ত্রী ও সেক্রেটারীরা যার রূপ ও গুণে মুগ্ধ তার জন্যে স্বতন্ত্র আইন তৈরি হবে বা প্রচলিত রীতি ও আইনের বাধা অপসারিত হবে—এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

এটা, এই জেটপ্লেনের গতিতে পদোন্নতি হওয়াটা মুকুট প্রথম প্রথম খুব উপভোগ করেছিল।

এ যে ওর স্ত্রীর গ্ল্যামারেরই ফল, সে বিষয়ে ওর সন্দেহমাত্র ছিল না।

গর্বে বুক দশ হাত হয়ে উঠত মুকুটের—এমন দীপ্তিময়ী স্ত্রীর স্বামী হওয়াটা যেন একটা বিশেষ কৃতিত্ব—ওর ভাবভঙ্গী দেখে তাই মনে হত।

কিন্তু ক্রমে বুঝল এর সবটাই সোনালী সৌভাগ্য নয়, সোনাটা আসলে গিলটি, ভেতরে কলঙ্কধরা পেতল ছাড়া কিছু নেই।

এ বোধটা এলো ঈর্ষা থেকে। আগে যাকে সুখ বলে মনে হয়েছিল, সুপেয় পানীয়, তাই বিষে পরিণত হলো—হয়ে উঠল জ্বালার কারণ। অবিরাম একটা দাহ।

যার কথা কাউকে বলা যায় না, যাকে প্রথম বলার কথা তার কাছেও না।

এ ওর স্বখাত সলিল। কোন্ লজ্জায় সে বলবে ঐ মানুষটাকে, গঞ্জনা বা ধিক্কার দেবে?

শুধু দূর থেকে গ্ল্যামার দেখে পুরুষ সন্তুষ্ট হয় না। বিশেষ যে দেবে সে কিছু পেতেও চায়।

জীবনের নিয়ম এটা, এর মধ্যে বিস্ময়ের বা ধিক্কারের প্রশ্ন ওঠে না।

সুতরাং যার হাতে দেবার ক্ষমতা আছে—তার কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করতেই হয়।

রুমার 'দেনেওয়ালা' একাধিক।

প্রথম দিকে দেহদানের কথা রুমা ভাবে নি, ভাবেন নি বোধহয় কর্তা-ব্যক্তিরাও।

উচ্চপদস্থ অফিসারদের অকুণ্ঠ ও সুব্যক্ত স্তুতি তারও ভালো লেগেছিল। শুদ্ধমাত্র তার সঙ্গলাভের জন্যই এ লোলুপতা ভেবে অকারণ কার্পণ্য করে নি।

ফলে পার্টির সংখ্যা ও সময় বেড়েই গিছল ক্রমাগত।

উপলক্ষ বা কারণের—যাকে ওঁরা সরকারী ভাষায় 'অকেশ্যন' 'ফাংশ্যন' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন—তা যেন আরও বেড়ে গেল।

এইসব 'অকেশ্যন' গজিয়ে উঠতে লাগল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মুকুটের মনে হলো কর্তাদের এখন প্রধান কাজই হয়েছে সকালে উঠে ভাবতে বসা—আজ কি উপলক্ষ ক'রে কোথাও কোনো হোটেলে চা-পার্টি কি ডিনারের ব্যবস্থা—কিংবা কনফারেন্স ও সেমিনারের আয়োজন করা যায়—যাতে গান শেষ হলেও তার রেশ থাকার মতো, বিশ্রাম ও চা পানের নাম ক'রে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষাকৃত নিভৃতে কাটানো যায়।···

এ অবস্থা অবশ্যই ক্রমে ক্রমে হয়েছে, পার্টির সংখ্যা বেড়েছে একটু একটু ক'রে, তারিখের ব্যবধান একেবারে হঠাৎই হ্রাস পায় নি।

তাই মুকুটও প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি। অফিস থেকে একা ফিরে প্রেম সিংহের শুষ্ক প্রশ্নের জবাব দেওয়া—'চা লাঁউ সাব?' কিংবা 'আজ ডিনার কা কেয়া হোগা?'—এবং যেটুকু খাবে তা ফরমাশ ক'রে অপেক্ষা ক'রে খাওয়া—অতিরিক্ত আপনা থেকে কিছুই পাবার জো নেই—এটা খারাপ লাগলেও অসহ্য মনে হয় নি।

ভাবতে চেষ্টা করেছে—কর্মক্ষেত্র ও সুনামের প্রসার হলে এটুকু সহ্য করতেই হবে।

সেও তো রোজই কিছু অফিস থেকে এক সময়ে বেরোতে পাবে না, তারও মিটিং কনফারেন্স প্রভৃতি থাকে।

তবে এটা মাঝে মাঝে মনে হত বৈকি—তফাতটা লক্ষ্য না ক'রে পারত না এক একদিন।

রুমা থাকলে নিত্য নূতন 'স্ন্যাকে'র আয়োজন ক'রে গরম রাখার ব্যবস্থা

করত। কোন্ খাবারের সঙ্গে কফি খাওয়া উচিত, কোনটার সঙ্গে চা—এসব তার জানা ছিল।

ডিনারে কি হবে এমন প্রশ্ন নিয়ে মুকুটকে কোনদিন মাথা ঘামাতে হয় নি।

কিন্তু চূড়ান্ত হলো একদিন—যেদিন গভীর রাত্রে অশোক-হোটেলের ডিনার-পার্টি সেরে ফিরতে মুখে মদের গন্ধ পেল মুকুট।

অকস্মাৎ যেন একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে বুকে কে ঘা দিল একটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো হাত-পা অবশ হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে কথা বলা কি ভাবার শক্তিও।

অনেক, অনেকক্ষণ বাদে আড়ষ্ট কণ্ঠে চেষ্টা ক'রে স্বর এনে বললো, 'তুমি, তুমি মদ খেয়েছ!'

'ছিঃ! মদ নয় সুধা। ঐ যে রামপ্রসাদের গান আছে না—কি যেন, মদ পান করিনে সুধা পান করি, মদোমাতালে মাতাল বলে। বিলিতি সুরা, চোরাই আমদানি করা বিশুদ্ধ স্কচ্—তুমি তাকে মদ বলছ! শেম্।'

হঠাৎ যেন ঝাঁ ক'রে খানিকটা রক্ত মাথায় চড়ে গেল মুকুটের, গলাটাও চড়ে উঠল সেই অনুপাতে, 'তাই বলে তুমি মদ খাবে!'

কঠিন হয়ে উঠল রুমার গলাও, 'কেন খাবো না—তুমি খাও না কোনো ডিনার পার্টি কি লাঞ্চে গেলে?'

'সে আমি জিভটা ঠেকাই মাত্র, সকলে খাচ্ছে, মুখে না তুললে খারাপ দেখায় বলে। তুমি তো রীতিমতো খেয়েছ—কথা আল্গা হয়ে গেছে!'

'ও কি আর অত হিসেব ক'রে খাওয়া যায়। কার কতটুকুতে কথা আল্গা হয় তাই বা কে জানে।...হাউ এভার, আমি এখন আর বকতে পারছি না। ভেরি টায়ার্ড—আমি শুতে যাচ্ছি।'

সে সেই পোশাকী শাড়ি-জামা না ছেড়েই গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বোধহয় আর দাঁড়াবার মতো অবস্থা ছিল না।

জুতোটাও পায়ে ছিল। সে পা বিছানায় ওঠার আগেই দাই জুতোটা খুলে নিল তাই রক্ষা।

সেও অবাক হয়ে গেছে।

কিছুদিন ধরেই তাদের বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ ঘটছে।

মনিবপত্নীর হাবভাব আচরণ তাদের ভালো লাগার কারণ নেই, লাগেও নি। এ কী রকম দাম্পত্য জীবন সে ও প্রেম সিং আলোচনা করেছে বার বারই।

সে রাত্রে মুকুট ঘুমোতে পারল না, ঘরে শুতেও গেল না।

রুমার পাশে গিয়ে এখন শুতে পারবে না।

লিভিং রুম—যাকে এখানে ডাইনিং কাম ড্রয়িং বলে বলেন কেউ কেউ—সেখানেই একটা সোফায় গা এলিয়ে পড়ে রইল।

সিগারেট খেত মুকুট, তবে দিনে চার-পাঁচটার বেশী নয়। সেদিন সারা রাতে দু প্যাকেট শেষ হয়ে গেল।

হয়ত তাতেই আরও ঘুম এলো না, এমনকি শেষ রাত্রেও।

পরের দিন সকালে উঠে স্নান সেরে রুমা যখন ব্রেকফাস্টে এসে বসল তখন পূর্বরাত্রির কথা স্মরণ ক'রে আর স্বামীর আরক্ত চোখ উদ্‌ভ্রান্ত ভাব আর আর পোড়া সিগারেটের পাহাড় দেখে একটু লজ্জিত হলো অবশ্যই।

সে লজ্জা আরও বেশী হলো যখন দেখল মুকুট সে প্রসঙ্গ উত্থাপনই করল না।

কতখানি আঘাত পেয়েছে দুঃখ পেয়েছে—সে চিহ্ন তো চোখ-মুখেই লেখা রয়েছে—লেখা রয়েছে তার ক্লান্ত দৃষ্টিতে, অবসন্ন ভঙ্গীতে—তবু সে যদি রুমাকে দেখামাত্র তিরস্কার করতে শুরু করত তাহলে কি হত বলা যায় না, অন্তত রুমা যে কঠিন হয়ে উঠত, সেও চোখা চোখা কথা বলত—সে বিষয়ে রুমা নিশ্চিত।

এই শান্তভাবে সহ্য করাতেই ফল ভালো হ'লো।

দু'জনের কেউই কিছু খেল না। প্রেম সিং-এর করা আণ্ডা পোচ, মচ্‌মচে টোস্ট প্লেটেই থেকে গেল। দুজনে শুধু দু কাপ কফি খেয়ে খাবারগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর রুমা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'ছাখো, এই জন্যেই আমি এ চাকরিতে ঢুকতে চাই নি, প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করলে

হয়ত বেশী সময় যেত, খাটতে হত বেশী, তবু তোমার কাছে থাকতে পারতুম বা তুমি আমার সঙ্গে থাকতে। এখানের যা রেওয়াজ—তোমারও জানা আছে। এদের চামড়াটা কারও কালো, কারও বাদামী, হয়ত সেইজন্যেই প্রাণপণে এরা সাহেবদের নকল করতে চায়। এ সহ্য করতেই হবে—উপায় নেই।'

'চাকরি ছেড়ে দাও।'

অতি কষ্টে উদ্গতপ্রায় বিপুল ক্ষোভ ও অনুযোগ দমন করে শান্তভাবেই উত্তর দেয় মুকুট।

'আর হয় না।' তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে রুমা, 'এত দূর উন্নতি ক'রে এখন হঠাৎ ছেড়ে দিলে সবাই ভাববে, আমার অক্ষমতার জন্যে ওপর থেকে চাপ দিয়ে রেজিগনেশ্যন নেওয়ানো হলো। তাছাড়া বড় পোস্টে চাকরি করার একটা নেশাও আছে বৈকি, ক্ষমতার নেশা, লোকের তোষামোদের নেশা—সে মোহ এতদিনে পেয়ে বসেছে। এখন সব ছেড়ে তোমার জন্যে রান্না করব ঘরে বসে, আর কখন কত রাত্রে বাড়ি আসবে—পথ চেয়ে থাকব—সে আর সম্ভব নয়। সে সুযোগ তুমি হেলায় নষ্ট করেছ। টাকা চেয়েছিলে, টাকা নিয়েই খুশি থাকতে হবে, আমি তো এক পয়সাও নিজে রাখছি না—তোমাকেই ধরে দিচ্ছি। সেদিক দিয়ে কিছু বলার নেই।

রুদ্ধকণ্ঠে মুকুট বলে, 'কেমন ক'রে বোঝাবো তোমাকে রুমা—যে টাকার জন্যে আমি তোমাকে চাকরি করতে পাঠাইনি। তোমার টাকা তোমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে—এক পয়সাও নিইনি আমি।'

'হয়ত তাই—কিন্তু সে কথা আমি কেন, কাউকেই বোঝাতে পারবে না।' বলতে বলতে প্রচণ্ড হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি ড্রেস করতে যাচ্ছি। আজ একটু আগেই আপিস যেতে হবে—একটা ইন্‌স্‌পেকশনে যেতে হবে গাজিয়াবাদে, সেক্রেটারী এসে তুলে নেবেন আমাকে, কথা আছে।'

এই বলে অনায়াসে খুব সহজভাবেই আর একটা হাই তুলে চলে যায় রুমা, মুকুট একটি কথাও বলার অবসর পায় না।

আর কী-ই বা বলবে।

সেইটেই তো ভেবে পায় নি এখনও। গত রাত্রের বিস্ময়ের সে প্রাথমিক বিহ্বলতাই তো কাটেনি।

নিষেধ করবে আজ আপিস বেরোতে?

আপিস ছাড়তে বাধ্য করবে?

কিন্তু বাধ্য কেমন করে করবে—তাই তো জানা নেই। সেটাই তো ভেবে পায় নি সারারাত ভেবেও।

যদি সে কথা না শোনে?

রাগারাগি করলে বাড়ি ছেড়ে যে কোনো হোটেলে কি হোস্টেলে গিয়ে উঠতে পারে। তারপর সরকারী ফ্ল্যাট তো পাওনাই আছে—ইঙ্গিত মাত্রে কর্তারা যেমন ক'রে হোক যোগাড় ক'রে দেবেন, প্রয়োজন হলে কাউকে উচ্ছেদ করতেও দ্বিধা করবেন না।

স্বয়ং সেক্রেটারী প্রসন্ন আর অনুগত যেখানে, শুধু তাই বা কেন—আপিসের নিজস্ব বিভাগে যে প্রতিপত্তির কাহিনী শুনেছে, কিছু রুমার মুখে, কিছু বা অন্যত্র থেকে—তাতে স্বয়ং বিভাগীয় মন্ত্রীই সক্রিয় হয়ে উঠবেন ওঁকে 'রিহ্যাবিলিটেট' করতে।

নিজেদের স্বার্থেই সক্রিয় হবেন।

রুমা স্বতন্ত্র একক থাকায় তাঁদের উৎসাহ অবশ্যই বেশী—সেটা এতদিনে মুকুট বুঝেছে।

সুতরাং কোনো পথ কোনো উপায়ই দেখতে পায় না সে।

যে পাশ্চাত্ত্য ফ্যাশন এবং এদেশীয় আধুনিকতা—চালে-চলনে, কথায়-বার্তায় প্রকাশ করতে তারা শুধু উৎসুক নয়, ব্যস্ত—এ তারই মূল্য।

যারা এইভাবে ফ্যাশনের দিকে ছুটে যায় তাদের সকলকেই বোধহয় এ মূল্য দিতে হয়।

বিশেষ মুকুটের মতো, সবদিক না ভেবে নিজের দিকটা চিন্তা না ক'রে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিকে চোখ বুজে এই ফ্যাশনকে অনুসরণ করে।

নিজের সুখ এবং শান্তির কথাও ভাবে না একবার, প্রয়োজনের কথা চিন্তা

করে না।

বিগত—তার পিতামহীর যুগের জন্য সে একটা 'নস্ট্যালজিয়া' গোছের অনুভব করে—যখন স্বামীর—ভদ্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ঘরের স্বামীরাও—স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে ঘা কতক বসিয়ে 'শিক্ষা' দিতে ইতস্তত করতেন না।

তেমনি—এ সত্যটাও সে মানতে বাধ্য—তাঁরা স্ত্রীকে একরাশ পরপুরুষের মধ্যে চাকরি করতে পাঠাবার কথাও ভাবতে পারতেন না।

অগত্যা কিছুই করা হয় না। প্রতিকার প্রতিবাদ কিছুই না।

নীরবে সহ্য করতে হয় নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অহঙ্কারের পরিণাম—আস্বাদ করতে হয় স্বয়ংরোপিত বিষবৃক্ষের ফল।

অতঃপর বোধহয় সহজও হয়ে আসে ব্যাপারটা, সহ্য হয়ে যায়।

ক্রমশ সপ্তাহে তিন-চারদিনই ওদের 'পার্টি' থাকে।

সেমিনার বা কনফারেন্স-এর অজুহাতও আর দেয় না রুমা—পরিষ্কার পার্টিই বলে, অমুক হোটেলে 'ডিনার খেতে গিছল অমুকের সঙ্গে।

বড় বড় পদস্থ কর্মচারীর অভাব নেই দিল্লীতে—ওদের বিভাগের সঙ্গে অপর যেসব বিভাগের যোগ আছে—সেখানেও সেক্রেটারী ডেপুটি সেক্রেটারী স্পেশ্যাল অফিসার ইত্যাদির অভাব কি?

কাজকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ বা ভবিষ্যৎ কোনো বৃহৎ কর্মপন্থা স্থির বা সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে মধ্যে মধ্যে কর্তাব্যক্তি-স্থানীয়দের একটু নিভৃতে বসা দরকার বৈকি।

আর সেক্ষেত্রে বড় হোটেলের প্রায়ান্ধকার মোমবাতিজ্বলা ডাইনিং হলের এক কোণের একটি টেবিলের চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে?

তার ফলে প্রেম সিং-এর তথাকথিত ডিনার অভুক্ত বা অস্পৃষ্টই থেকে যায় এইসব দিনে।

কোনোদিন হয়ত ফোন ক'রে বলে দেয় রুমা—কোনোদিন সে অবসরও থাকে না।

সত্যিই থাকে না হয়ত, কোথাও কোনো ইন্‌স্‌পেকশ্যন সেরে ফেরার পথে

বা আপিস থেকে দেরি ক'রে বেরিয়ে হঠাৎই এই সব ভোজের কথা ঠিক হয়।
ঈপ্সা যেখানে প্রবল, সেখানে প্রয়োজন খুঁজতে দেরি হবেই বা কেন।
হয়ত হোতা বা হোতারা সকাল থেকেই প্রস্তাবের ধরন, ভাষা এবং ভোজের অনুষ্ঠান ঠিক ক'রে রাখেন।
উপযুক্ত স্থানগুলির তালিকা হয়ত করাই আছে। বা থাকে।
হঠাৎ-প্রস্তাবের ভাষা ও ভঙ্গীও।

প্রথম প্রথম বেশ ক'দিন মুকুটেরও খাওয়া হয় নি।
অপেক্ষা ক'রে থেকে থেকে, রাত এগারোটা কি সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরে রুমা যখন জানিয়েছে সে অমুক হোটেলে ডিনার খেয়ে বেরিয়েছে বা অমুক হলের একটা ডান্স-ড্রামা দেখতে রাত হয়ে গেল বলে একটা জায়গা থেকে স্ন্যাক্‌স্ আর কফি খেয়ে এসেছে— বা কোনো রেস্তোরাঁয় চাউমিন আর প্রন-পকৌড়া—খুব খিদে পেয়ে গিছল, ইত্যাদি—তখন মুকুটেরও আর আহারে রুচি থাকে নি।
অরুচি প্রেম সিং-এর রুটি, আর মুর্গীর ঝোলে নয়— আহারে, জীবনধারণেই অরুচি।
প্রেম সিং কি দাইয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করেছে না এ নিয়ে— নিশ্চয়ই করছে।
সেই কল্পিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে নিজেকে গোপন করতেই যেন শরীর খারাপের অজুহাতে—অথবা সেও আপিস থেকে একটু হেভী টি খেয়ে এসেছে বলে গিয়ে শুয়ে পড়ত।
রুমা অবশ্য কয়েকদিনই বলেছে, 'আমার তো এই অনিশ্চিত ফেরা— তুমি তোমার সময় খেয়ে নাও না কেন? আমি যখন ফিরব, প্লেটে ক'রে খাবার নিয়ে তোমার কাছে বসে খাবো।'
এটাও ভালো লাগে নি প্রথমে। পরে বুঝেছে যে, এছাড়া কোনো উপায় নেই।

'চোরের ওপর রাগ ক'রে মেঝেয় ভাত খায়' বেকুবেই।

যে স্ত্রী ঘরেও থাকবে না, অথচ যাকে ত্যাগও করা যাবে না—তার ওপর অভিমান করে উপবাস করা আরও বেকুবি।

বিশেষ এতে যেন অবস্থাটা আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় চাকর-ঝিকে।

অগত্যা—এটাও গলাধঃকরণ করতে হয়, এই ব্যবস্থাটা।···

এতবড় ঘরে আটজন বসার মতো ডাইনিং টেবিলে একা বসে খাওয়া—তাও সইয়ে নিতে হলো।

শুধু সে চেষ্টা করত ওদের সাধারণ খাওয়ার সময়—নটার আগেই খেয়ে নিতে।

অর্থাৎ খুব খিদে পেয়েছে বলেই আগে খেয়ে নিতে হলো, ঝি-চাকরদের কাছে—যাকে বলে 'ফেস সেভিং'—এইটুকু বজায় রাখতে। এর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত আটটার আগেই ফিরতে।

যে সব দিনে স্ত্রী অনুগ্রহ ক'রে এসে বলত সেও ডিনার খাবে—যেন ওর এবং প্রেম সিং-এর ওপর অনুগ্রহ ক'রেই—সে সব দিনে একটু মুখ কাঁচু-মাচু করার ভঙ্গী ক'রে বলত, 'আমি কিন্তু আজ আগেই খেয়ে নিয়েছি—আজকাল বিকেলে আপিসে কিছু খাইনে তো, খুব খিদে পেয়ে যায়।'

এই ভদ্র কৈফিয়তটা দিত ওদের দিনে-দিনে-ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ওপর একটু পর্দা টেনে দিতে।

তবে এও জানত, বুঝতে পারত যে, যাদের জন্য এ মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া—তারা এতে ভোলে না।

তারা ওদের সম্পর্ক নিয়ে নিশ্চয় হাসাহাসি করে, তাকে অপদার্থ ভেবে করুণার চোখে দেখে।

হয়ত বিলিতি মতে ওর মাথায় সিং গজিয়েছে কিনা চেয়ে চেয়ে দেখে।

তাদের যে এত ইংরেজী লেখাপড়া জানার কথা নয়—অপমানে লজ্জায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে বলেই সে কথাটাও ভুলে যায়।

তবু পাশে শোওয়াটা বজায় ছিল এতদিন।

যদিও দুটো খাট তবু সে খাট দুটো গায়ে গায়ে লাগাই ছিল।

সওয়া তিন ফুট খাটে একজনের শুতেও অসুবিধা হয় কিন্তু দুটো জোড়া দিয়ে সাড়ে ছ ফুট হলে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট, বরং অনায়াসে একটা শিশু নিয়েও শোওয়া যায়।

হয়ত খাটের এ মাপ অনেক হিসেব ক'রেই স্থির হয়েছিল।

সন্তানের শখ ছিল বৈকি রুমার। ছিল না মুকুটের।

তার ধারণা আরও বছর কতক গেলে সে কথা চিন্তা করা যাবে।

জীবন উপভোগ করার জন্যে শুধু নয়—অন্য যারা বিলম্বে সন্তান চায় তাদের ঐটেই প্রধান উদ্দেশ্য—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যেই এত তাড়াতাড়ি সন্তান কাম্য নয় তার।

ছেলেমেয়ে হলেই ঝঞ্ঝাট বাড়বে, সেইদিকেই সমস্ত শক্তি, সময় ও উদ্যম ব্যয় হবে।

জীবনে উন্নতি করতে গেলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার।

সমস্ত মন, চিন্তা ও পরিশ্রম দিয়ে সেই ভাগ্যের সৌধ গড়ে তুলতে হয়।

এ প্রতিষ্ঠা নিজেরও বটে, স্ত্রীরও বটে।

দুজনের কথাই ভেবেছিল, সন্তানের আগমন বিলম্বিত করার কথা চিন্তা করার সময়।

যে স্ত্রী মেডিকেল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার থেকে স্কলারশিপ ও মেডেল পেয়ে ডাক্তারী পাস করেছে সে শুধু ছেলের কাঁথা পাল্‌টে তাকে কাজল পরিয়ে দুধ খাইয়ে জীবন কাটাবে, সেকেলে ভারতীয় বধূদের মতো স্বামীর মনোরঞ্জন ক'রে তার জন্যে রান্না ক'রে ছেলে মানুষ ক'রে দিন কাটাবে—এ চিন্তাও অসহ্য বোধ হত মুকুটের।

অথচ—সে প্র্যাকটিশ করবে—চেম্বারে বসে রুগী দেখবে কিংবা নার্সিং হোম ক'রে—তাতেও ওর মন সায় দিত না।

যদি প্র্যাকটিশ জমে ওঠে তাহলে কি হবে তা জানা ছিল মুকুটের।

কলকাতায় দেখেছে, বোম্বেতে দেখেছে। ভাগলপুরে একটি মেয়েকে দেখেছে

—মিসেস চৌধুরী কে।

ভোর থেকে মেয়েটির চেম্বারের সামনে ভিড় হত—এদিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ওদিকে আবার বিকেল চারটে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত। এর মধ্যে কল সারা আছে, অপারেশন আছে, কঠিন কেসের ক্ষেত্রে প্রসব করানো আছে।

সময়াভাবেই তাদের ছেলেপুলে হয় নি।

স্বামী বেচারী মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়—অমন বলিষ্ঠ চেহারার সুন্দর সুপুরুষ স্বামী, মুকুটেরই সহপাঠী—স্ত্রীর নাগালই পায় না। রাত্রে দেখা হয়, খাবার সময়ও হয় এক আধদিন কিন্তু তখন মিসেস চৌধুরী এত ক্লান্ত থাকেন যে খাওয়ার টেবিলে যদি বা সেদিন একসঙ্গে বসে খাবার সৌভাগ্য হয়, দু-একটা কথা বলার অবসর মেলে, শোবার পর দু মিনিটে ঘুমিয়ে পড়েন। তাও এক-একদিন রাত্রে সেই অবস্থায় উঠে আবার ছুটতে হয় —কোনো পরিচিত পরিবারে, যারা চিরদিনই ওঁকে ডাকে—কোনো কঠিন অসুখের খবর পেলে।

না, এতেও রাজী নয় মুকুট।

তার চেয়ে চাকরি ঢের ভালো।

বাঁধা সময় কাজ, অথচ উন্নতির সম্ভাবনাও অনেক।

আজকাল চারিদিকে মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, যে কোনো একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হওয়া রুমার মতো লেখাপড়ার রেকর্ড যার—কিছুই নয়। কত অসংখ্য ইনস্টিটিউট গজাচ্ছে, তার একটায় ডিরেক্টার, পাবলিক হেল্‌থ্‌ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার, ডিরেক্টার—তা থেকে মিনিস্ট্রিতে বড় পদ পাওয়া—এসবই অনায়াস-লভ্য।

অথচ এতে অত খাটুনি বা সময়াভাব নেই। স্ত্রীর সঙ্গ দুর্লভ হয়ে উঠবে না।

দু-চার বছর পরে সন্তানের কথাও ভাবা যেতে পারবে।

ওদের এমন কিছু বয়স হয় নি যে, এখনই সন্তান না হলে আর তাকে বা তাদের মানুষ করা যাবে না।

যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়?
সে তো যে কোনো সময় হ'তে পারে। এখনও তো, আজও মরতে পারে সে। দুর্ঘটনা ছাড়াও অল্প বয়সে মৃত্যু তো কত ঘটছে।
এই তো সেদিন ওর এক বন্ধু মাত্র আটাশ বছরে মারা গেল।
স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী, প্রাণোচ্ছল ছেলে। তার নাকি বহুদিনের চাপা নেফ্রাইটিস ছিল, কেউ ধরতে পারে নি।
না, দৈবের ওপর তাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু দৈব যতক্ষণ না হস্তক্ষেপ করছেন, ততক্ষণ নিজেদের হাতে যে সব উপায় আছে, সেইমতো জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করবে না কেন?
কিন্তু চাকরির উন্নতির কথা যখন ভেবেছে তখন এত উন্নতির সম্ভাবনা ভাবতে পারে নি।
প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছে—এই ধরনের উচ্চতা আশা করে নি।
মনে আসে নি এই পরিণামের কথা, এই পরিণতির কথা।
নিজে হাতে একদিন জোড়া খাট সরিয়ে মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে হবে, তাও তো তখন ভাবে নি যখন একমনে এই একটা মূঢ় অর্থহীন অহঙ্কারের চারায় আশা ও প্রচেষ্টার জল দিয়ে গেছে।
অথচ তাই তো করতে হলো তাকে।

সেই প্রথম অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফেরার পর থেকে—ডিনার খেয়ে ফেরার দিনগুলোতে এক-আধদিন একটু-আধটু গন্ধ ছাড়া অতিরিক্ত পানের কোনো লক্ষণ এর মধ্যে আর লক্ষ্য করে নি মুকুট।
বোধহয় বাড়াবাড়িটা নিজের কাছেই লজ্জাজনক বোধ হয়েছিল, মুকুটের শ্রান্তভাবে সহ্য করাটাও হয়ত বিবেক দংশনের কারণ হয়েছিল একটু।
সে ওপরওয়ালাদের চাপ সত্ত্বেও তাই এই একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিজের রশি টেনে রেখেছিল বেশ শক্ত ভাবেই।
কিন্তু মাস পাঁচ-ছয় পরে হঠাৎই একদিন একেবারে প্রায় অচৈতন্য অবস্থাতে ফিরল রুমা।

ফিরল কারও গাড়িতে নয়, অফিসের গাড়িতে তো নয়ই—একটা সাধারণ ভাড়াটে অটো রিকশায়।

একটি ছোকরা শিখ ড্রাইভার, সে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে এসে ওদের ডেকে জানাল যে কেউ গিয়ে 'মেমসাহেবকে গাড়ি থেকে তুলে আনুক—মেমসাহেব একেবারেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন।'

প্রেম সিং ইতস্তত করতে করতেও এগুলো। সে আর আয়া দুজনে গিয়ে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো রুমাকে।

মুকুট পাথর হয়ে গিয়েছিল একেবারে, তার কিছু করা কি এগিয়ে গিয়ে তু'লে আনার কোনো ক্ষমতাই ছিল না, সেই মুহূর্তে—কিছু যেন মাথাতেও যাচ্ছিল না—এতই অবিশ্বাস্য, এতই লজ্জাজনক এ ঘটনাটা।

তারপর অবশ্য জেরা করেছিল কিছু স্কুটারওয়ালাকে।

কিন্তু উত্তর যা পেয়েছিল তা আরও অবিশ্বাস্য আরও লজ্জাজনক।

উত্তর পাওয়ার পর মনে হলো এদের সামনে এসব প্রশ্ন করাই উচিত হয় নি।

কোনো বড় হোটেল নয়, করোলবাগের সাধারণ একটা নিম্নস্তরের বার-এ একা বসে মদ খেয়েছেন মেমসাহেব।

এত মদ তারা ওঁকে দিতে চায় নি, কে যেন ওঁকে চিনতে পেরেছিল, উনি যে বড় 'অফিসার' একজন জানত—সে-ই বারণ করেছিল।

মেমসাহেব চেঁচামেচি করেছেন, ব্যাগ থেকে একমুঠো দশ টাকার নোট বার ক'রে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মেরেছেন বারের মালিকের মুখে। তখন অগত্যা তাকে আরও মদ দিতে হয়েছে।

তারপর যখন বেহুঁশ হয়ে একেবারে টেবিলের তলায় পড়ে গেছেন—তখন তারা প্রমাদ গণেছে, মদওয়ালারা। ওঁর কিছু বলার শক্তি ছিল না, যে সাহেব ওঁকে জানত, সে-ই ঠিকানা বলে দিয়েছে, ওঁরই ব্যাগ থেকে দশটা টাকা বার করে স্কুটারওয়ালার হাতে দিয়ে ব'লে দিয়েছে এখানে পৌঁছে দিতে; নোটের মধ্যে যা বাঁচবে তাও ওকেই নিতে বলেছে তাঁরা।

ব্যাগ গাড়িতেই পড়ে আছে, তার মধ্যে কী টাকাকড়ি আছে তা সে

জানে না, এঁরা সেটা নিয়ে এসে দেখে নিন, সে ব্যাগে হাতও দেয়নি ইত্যাদি।—

প্রেম সিং আর আয়াই মেমসাহেবকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে কাপড় জামা বদলে দিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। রুমা কিছুই টের পেল না। দু-একবার বিড়বিড় ক'রে কী বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার কোনো কথাই বোঝা গেল না।

মুকুটের মনে হয়েছিল তার লজ্জিত হবার অপমানিত বোধ করার শেষ সীমা পার হয়ে এসেছে সে। আজ বুঝল, এখনও অনেক বাকি।

এখানের এই শ্রেণীর বেশি মাইনের ঝি-চাকররা বড় লোক 'সাহেব-মেম-সাহেবদের' অনেক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীতে অভ্যস্ত, তারা কোনো প্রশ্ন করল না—এমনকি কিছু বিস্ময় বা ক্ষোভও প্রকাশ করল না - কিন্তু মুকুটের মনে হলো সে আর কোনোদিন ওদের কোনো অপরাধেই চোখের দিকে চেয়ে শাসন করতে পারবে না।

সেই রাত্রেই দরজা বন্ধ করে, একা টানাটানি করে নিজের খাটটা হাত-খানেক সরিয়ে নিল রুমার খাট থেকে।

হয়ত ঠিক সোজা হলো না, অথবা আর একটু সরিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু সে একা, এই প্রায় অবশ হাত-পায়ে আর বেশী সরাতে পারল না।

এ কাজে প্রেম সিংকে ডাকা যায় না।

তবে, হয়ত পরের দিন ওদের অনুপস্থিতিতে আয়াই বিছানা সাফ করতে এসে প্রেম সিংকে ডেকে এগুলো ঠিক ক'রে নেবে।

সেই সঙ্গে কিছু সরস আলোচনাও করবে দুজনে।

সাহাব লোগদের ইতরতা নিয়ে কটু মন্তব্য করবে

ভাগ্যকে ধিক্কার দেবে এদের মতো অপদার্থ ইতর লোকদের দাসত্ব করতে হচ্ছে বলে।

৩

কারণ ও কার্য সবই জানা গেল, ক্রমে ক্রমে, যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন অনু-সন্ধানে। কিছু রুমা নিজেও বললো।

তবে সর্বনাশের পরিণামটা বোঝা গেল আরও মাস তিন-চার পরে।

এর সূচনা হয়েছিল কিছুদিন আগেই।

রুমা যে ইচ্ছে ক'রে নিজেকে নষ্ট করছে এটা বুঝতে পেরে তার সন্তান-বুভুক্ষার তীব্রতাটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল মুকুট।

অনেক আগেই বুঝি করা উচিত ছিল।

এতদিন করতে পারে নি বলে নিজেকেই দোষী করেছে সে, তিরস্কার করেছে।

করতে পারে নি ঠিক নয়, আসলে করতে চায় নি। সেটা আজ আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

প্রিয়তমা স্ত্রীর চোখের পাতা নড়ার অর্থও মুগ্ধ স্বামীর বোঝা উচিত।

মুকুটও বুঝত যদি না জোর ক'রে চোখ বুজে থাকার চেষ্টা করত।

একদিন ভয়ে ভয়ে সে কথাটা তুলেও ছিল কিন্তু প্রায় চিৎকার করে উঠে-ছিল রুমা, তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল, 'না। এই মন নিয়ে এই জীবনের মধ্যে ছেলে। তাকে কি শিক্ষা দোব। কে দেবে। ঝি কি দাইয়ের হাতে ছেলে-মেয়ে মানুষ হওয়ার পরিণাম আমি অনেক দেখছি— আমার ছেলের সে পরিণাম আমি দেখতে চাই না। অমানুষ ছোটলোক তৈরি হবে। নাঃ মিঃ চক্রবর্তী, সে সম্ভাবনা তুমি নিজে নষ্ট করেছ, আর এখন ও কথা তুলে লাভ নেই।'

এ যে কতখানি হতাশা, আশাভঙ্গের কী প্রচণ্ড ক্ষোভ, তার ঐ কণ্ঠস্বরের তীব্রতা আর তীক্ষ্ণতাতেই বুঝতে পারে মুকুট।

এমন যে হবে, তা আগে বোঝে নি। যে মেয়ে এত সসম্মানে ডাক্তারী পাস করেছে সে ঘরে বসে স্বামীর জন্যে রান্না করা আর ছেলে মানুষ করাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করবে, এ জন্ম সফল হলো ভাববে—এটা মুকুট প্রথমের দিকে কল্পনাই করতে পারে নি।

যেমন আর পাঁচটা এরকম ক্ষেত্রে হয়—দু-এক বছর চাকরি করার পর ছেলেমেয়ে হবে, তার জন্যে আলাদা ছুটি আছে, য়্যালাউন্স আছে—তারপর কিছুদিন দাইয়ের কাছে থাকবে দুপুরটা, তারপর ক্রেস আছে, নার্সারী স্কুল আছে—ছেলেমেয়ে আগলাবার কোনো অসুবিধাই নেই।

ছেলেমেয়ের শখ মুকুটেরও যে একেবারে ছিল না তাও তো নয়—শুধু সে চেয়েছিল, দু-তিনটে বছরে দুজনেই একটু প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়ে তবে সংসারের এই সনাতন নিয়মে ধরা দেবে।

রুমা এত শিক্ষিত, সত্যিকার লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়ে এ ব্যাপারটাকে এত বিতৃষ্ণার চোখে দেখবে, এটাকে স্বামীর জুলুম, তার অর্থলোভ বলে ভাববে তা কে জানত!'

এই বিতৃষ্ণা এই ক্ষোভ ও হতাশা অন্যদিক দিয়েও প্রকাশ পাচ্ছিল—কিছুদিন থেকেই।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান আগমন প্রতিরোধের কারণও আর থাকছিল না।

স্ত্রীর এই বিরূপতা, ক্রমশ যেন স্বামী সম্বন্ধে অশ্রদ্ধায় পরিণত হচ্ছিল। ওদের দাম্পত্য জীবনটার মধ্যে সে মনোভাব কখন ধীরে ধীরে তার একটা দীর্ঘ কালো ছায়া বিস্তার করছিল তা অনেকদিন পর্যন্ত টেরই পায় নি মুকুট।

পাশে এত কাছাকাছি শোয়, স্ত্রী যে প্রকাশ্যে কোনো ঘৃণা বা অবহেলা প্রকাশ করেছে তাও নয়, কঠিন কথাও বলে নি কখনও—তবু কোথায় যে একটা দূরত্ব গড়ে উঠছিল, গড়ে তুলছিল রুমা তার আপাত-সাধারণ সহজ ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় তা ঠিক না বুঝলেও ইদানীং যেন আগের মতো

যখন তখন স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে বা কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেতে কি পুরুষত্বের অধিকার দাবি করতে সাহসে কুলোত না।

অপমানের ভয়?

প্রত্যাখ্যানের ভয়?

রূঢ় কথার ভয়?

এর কোনোটাই নয়—অথচ কি একটা কুণ্ঠা, সাহসের অভাব, একটা অজ্ঞাত নাম না জানা আশংকা—কী যে তা মুকুট বোঝাতে পারবে না।

অবশ্য রুমা আসতই ক্লান্ত হয়ে। শোবার পরক্ষণেই তার কথা যেত জড়িয়ে, বিশেষ যেদিন বাইরের কোনো পার্টি থেকে আসত সেদিন তো কথাই নেই।

যত অল্প মাত্রাতেই খাক—সুরা তার আচ্ছন্নতা আনবেই—বোধহয় যেন কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই ঘুমিয়ে পড়ত।

সুতরাং স্বামীর প্রাপ্য দাবি করার সাহস আছে কিনা মুকুটের সে পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন ঘটত না।

যেদিন এই চরম ঘটনাটা ঘটল—দুই খাটের মধ্যে ব্যবধান রচনার কারণ দেখা দিলো—সেদিন হিসাব ক'রে দেখল মুকুট, তার আগে চার মাসের মধ্যে একটা রাত্রিও তাদের দাম্পত্য প্রণয় দৈহিক প্রণয়ে প্রকাশিত হবার অবকাশ পায় নি।

সেদিনের এই উন্মত্ততার কারণ সংগ্রহ করতে খুব বেশিদিন সময় লাগে নি।

সে রাত্রের ঐ কুৎসিত অবস্থার কথা রুমার সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্তারা কেউ জানতেন না—সে যে একা বেরিয়ে গিয়ে ঐ অখ্যাত—হয়ত কিছুটা কুখ্যাতও—পল্লীর মদের দোকানে ঢুকেছে তা জানা তো দূরের কথা, তাঁদের কল্পনার অতীত।

ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত রুচির মেয়ে—যে জন্যে ওপরওলারা পর্যন্ত তাকে সমীহ ক'রে চলেন, এত পছন্দ করেন—সে এ কাজ করতেই পারে না, এই তাঁদের বিশ্বাস।

তবে তাঁরা কোনো খবর দিতে না পারলেও অপরে দিয়েছিল।

সেদিন নতুন একটা কলোনীতে এক ইস্কুল বাড়িতে শিশু-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন ছিল।

উদ্বোধন করার জন্য উদ্যোক্তারা রুমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রথমটা যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল রুমা; জানিয়েছিল তার কারণ—শিশু সম্বন্ধে ইদানীং তার একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আতঙ্ক—হ্যাঁ, আতঙ্কই বলতে হবে—ফোবিয়া বললেও অত্যুক্তি হয় না।

পথে-ঘাটে ফুটফুটে ছেলে দেখলে অনেকেই আদর করে, গাল টিপে দেয়, দু-একটা মিষ্টি কথা বলে।

একেবারে অপরিচিত ক্ষেত্রেও।

আর দিল্লী শহরে পুতুলের মতো ফুটফুটে ছেলেমেয়ের অভাবও নেই, পাঞ্জাবী শিশুরা অধিকাংশই সুন্দর হয়, আদর করার মতোই, বরং বড় হয়ে একটু চোয়াড়ে চেহারা হয়ে যায় অনেকের।

এইভাবে আদর করার প্রলোভন মুকুটও সামলাতে পারত না।

কিন্তু রুমা ইদানীং মুখ ফিরিয়ে চলে যেত, বরং সেই জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করত হনহন করে হেঁটে।

এমনকি সভা-সমিতিতেও, অফিসের পদমর্যাদা অনুসারে যেসব সভায় উপস্থিত হতে হত—তেমন কোনো শিশু সামনে পড়লে কঠিন হয়ে উঠত যেন, সে সময় ওর মেজাজেরও ঠিক থাকত না।

এটা কিছুদিন পরে অন্য সহকর্মীদেরও নজরে পড়েছে, তাঁরা এটা নিয়ে আলোচনাও করেছেন।

এখনও কেন ছেলেমেয়ে হয় নি ওর—তার কারণ এই বিতৃষ্ণাই ধরে নিয়েছেন।

রুমার দুর্বোধ্য আচরণকে বিতৃষ্ণা বলেই যদি ধরে নেন তাঁরা—বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

এ আলোচনা আর ওঁদের সিদ্ধান্ত অনেক কান ঘুরে মুকুটের কানেও পৌঁচেছে একটু-আধটু।

আগে অতটা বুঝত না—এই শেষের দিকে এ আপাত-বিতৃষ্ণার কারণ বুঝতে শুরু করেছিল।

কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনের উপায় খুঁজে পায় নি।

কেন যে রুমার মনে হয়েছে সন্তান ধারণের সময় পার হয়ে গেছে তার—এ কথাটা কিছুতেই মাথায় যায় নি মুকুটের।

তবু সেদিন শেষ পর্যন্ত এই সভায় যেতে রাজী হয়েছিল রুমা। কোনোমতেই এড়াতে পারে নি।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে দু-তিনটে প্রবীণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং পরিচিত কয়েকটি মহিলা এমনভাবেই এসে চেপে ধরেছিলেন যে, কোনো ভদ্রতাসঙ্গত উপায়ে 'না' বলতে পারে নি।

দু-একজন অন্য অফিসারও ছিলেন বৈকি।

তাঁদের আশা ছিল যে সভার শেষে যথারীতি কোনো একটা ঘাঁটিতে গিয়ে একটু আড্ডা দিতে পারবেন।

কিন্তু সভার কাজ চলতে চলতেই রুমার মুখ চোখের অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল যে, সেটাকে অসুস্থতা বলেই ধরে নিয়েছিলেন সবাই।

সহকর্মীরা ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। সভার উদ্যোক্তারাও।

রুমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথমেই। তখন বিচার চলছিল—মানে কোন্ কোন্ শিশুকে মেডেল বা সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে তাই—বিবেচনা করছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

তাঁরা পদাধিকার হিসেবেও বটে এবং সহজ সৌজন্য হিসেবেও বটে—রুমাকে অনুরোধ করেছিলেন পুরস্কার বিতরণী পর্যন্ত থেকে যেতে।

সেই সময়েই বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল রুমা। অন্তত তাই বোধ হয়েছিল সকলের।

উপস্থিত দু-একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করার প্রস্তাবও করেছিলেন, ইস্কুলের আপিস ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করার কথাও বলেছিলেন কেউ কেউ—কিন্তু রুমা তা শোনে নি, জেদ করেছিল বাড়ি ফেরার জন্যে।

সহকর্মী ও বন্ধুরা এতদিনে ওকে কিছু কিছু চিনেছিলেন। এই সুন্দরী মেয়েটির কোমল মুখ যখন অকস্মাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে কঠিন হয়ে ওঠে তখন কোনো সৌজন্য বা ভদ্রতার ধার ধারে না, কারও অনুরোধেই নিজের ইচ্ছা বদলায় না।

ওপরওলাদের অনুরোধেও না।

তাই তাঁরা বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাই করেছিলেন।

গাড়ির অভাব ছিল না। সরকারী গাড়ি তো ছিলই, উদ্যোক্তাদেরও গাড়ি ছিল কখানা। তারই একখানা বড় গাড়িতে তুলে দিয়ে সঙ্গে একজন লোক দিতে চেয়েছিলেন। অকস্মাৎ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল রুমা, রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে একরকম জোর ক'রেই তাঁদের সরিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে শোফেয়ারকে বলেছিল, 'এই ছোড়ো জলদি।'

তবে বাড়ি ফেরে নি সে।

সভার পাড়া ছাড়িয়ে এসেই চালককে নির্দেশ দিয়েছিল এই পাড়ায় আসতে। এই কিছুটা কুখ্যাত পাড়ায়।

সে বিস্মিত হলেও এই মেজাজী মেমসাহেবের হুকুমের ওপর দ্বিরুক্তি করতে কি ওস্থানে যাওয়ার শোভনতার প্রশ্ন তুলতে সাহস করে নি।

তখনও না, মেমসাহেব যখন ঐ নিম্নস্তরের-খরিদ্দার-অধ্যুষিত বার-এ নিয়ে গাড়ি থামাতে বলেছিলেন—তখনও না।

তবু, মেমসাহেব ভেতরে ঢোকার পরও দু-এক মিনিট অপেক্ষা করেছিল—যদি তিনি ভেতরের আবহাওয়া দেখে মত বদল ক'রে বেরিয়ে আসেন আবার—এই কথা ভেবে।

কিন্তু মেমসাহেব তা আসেন নি।

৪

অটোরিক্‌শাতে ওঠার সময়ও হুঁশ ছিল না রুমার। ওঠার পরেও না। বেহুঁশ হতেই চেয়েছিল সে। প্রাণপণে সাধনা করেছিল বলতে গেলে জ্ঞান হারাবার।

এতক্ষণে চেষ্টা সফল হয়েছে। বেহুঁশই হয়েছে।

এই রাশি রাশি বিষাক্ত পানীয় খাওয়া তো সেইজন্যেই।

একটি শব্দ, দুটি মাত্র অক্ষরের সমষ্টি যে এমন সাংঘাতিক হয় — এমন মর্মান্তিক আঘাত দিতে পারে, তা কে জানত!

স্কুলবাড়ির সামনের সিঁড়ি আর বিস্তৃত মাঠ সবটা নিয়ে সভার আয়োজন। সিঁড়ির ঠিক নিচে ছিল সম্ভ্রান্ত অতিথিদের বসবার মঞ্চ, 'ডায়াস'। পিছনে সিঁড়িতে বহুলোক দাঁড়িয়ে, স্ত্রী-পুরুষ দুইই, আর তাদের সঙ্গে অগণিত শিশু—এখানকার ভাষায় 'বাচ্ছা'।

সিঁড়িতে, সিঁড়ির পিছনের বিস্তৃত বারান্দাতেও।

আরও বহুলোক তাদের পিছন দিয়ে স্কুলবাড়ির মধ্যে যাতায়াত করছিল। প্রয়োজনও ছিল যাতায়াতের কারণ ভেতরের উঠোনে একটা ছোটখাটো সাধারণ স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল—কিছু ছবি ও চার্টে—কিছু মাটির পুতুলের সাহায্যে।

রুমা তার উদ্বোধনী ভাষণ শেষ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শিশুদের দেখে বিচার করার ভার তার নয়। সেজন্য অন্য লোক ছিলেন।

সে আগেই ভেতরে গিছল—স্বাস্থ্য প্রদর্শনী দেখতে। কারণ এটার ব্যবস্থা করেছে তারই দপ্তর—সরকারী আনুকূল্য এটা—উৎসাহদানের ব্যবস্থা। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়—সকলে যখন যথাসাধ্য ভিড় সরিয়ে রুমার আসবার ব্যবস্থা করছে তখন—সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি

দু-আড়াই বছরের ছেলে কোনোমতে ফাঁক পেয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল 'মাম্‌মী'।

ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান শিশু, তার দু চোখে জল, দৃষ্টিতে আকুলতা। হয়ত তার মা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে, মাকে দেখতে পাচ্ছে না—রুমার মধ্যে সেই মার কতকটা সাদৃশ্য দেখতে পেয়েই হয়ত এমনভাবে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

অবশ্য তখনই অনেকগুলি হাত শিশুটিকে সরিয়ে নিল, হয়ত ততক্ষণে তার মাও এসে গেছে, খুঁজে পেয়েছে নিজের বাচ্ছাকে।

কিন্তু সেই থেকেই রুমা আর প্রকৃতিস্থ হতে পারে নি।

প্রকৃতিস্থ হতে পারার কথাও নয়।

এমন একটি সোনার পুতুলের মতো শিশু 'মা' বলে পরম আশ্বাসে জড়িয়ে ধরেছে—নিঃসন্তান নারীর কাছে এ যে এক সকল-চেতনা-হরা ঘটনা।

বিশেষ যে নারী মা হ'তেই চায়। চায় এমনি অনেকগুলি শিশু গর্ভে ধারণ করতে—তাদের পালন করতে।

গৃহস্থালীই যার স্বপ্ন, জননীত্বই যার সার্থকতার স্বরূপ!

যে ঘটনা অসম্ভবও নয়—অন্তত ছিল না।

ওদেরই সহজ-সাধ্যে ছিল তা।

'অগ্নিশলাকার মতো কর্ণে প্রবেশ করা' কথাটা এতদিন সেকালের নানা উপন্যাসে পড়া ছিল—'গলিত সীসকএর মতো' কানে যাওয়াও কোন্ বইতে পড়েছিল, কিন্তু সে তখন অত বোঝে নি, কবিজনোচিত অতিশয়োক্তি ভেবেছিল—আজ বুঝল কথাগুলোর অর্থ।

বুঝল কিন্তু একান্ত কাম্য, সর্বাধিক ঈপ্সিত সেই ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত এক প্রতিক্রিয়া হলো রুমার মনে।

আধা মধুর কণ্ঠের পরম নির্ভরতার ডাক—'মাম্‌মী'—স্নেহে বিগলিত হবার কথা, সাগ্রহে সানন্দে বুকে তুলে নেওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু রুমার মনে হলো দুই কানের মধ্যে দিয়ে তীব্র য়্যাসিড কে ঢেলে দিলো।

কান শুধু নয়, কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত দেহ, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, মস্তিষ্ক,

স্নায়ু—সব যেন অবশ হয়ে গেল। দুই পায়ে কোনো জোর রইল না। ভাগ্যে কে যেন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্যে ওর হাত ধরেছিল, নইলে খুব সম্ভব সেখানেই পড়ে যেত।

তারপর থেকেই অসুস্থ বোধ করছে সে।

ঠিক অসুস্থও নয়—কেমন একটা অস্বস্তি, কেমন একটা যন্ত্রণা—সে কাউকে বোঝাবার নয়, নিজেই ঠিক বুঝতে পারছিল না।

ওর কি স্ট্রোক হবে?

সেরিব্রাল স্ট্রোক?

অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।

হে ভগবান, তাই ক'রে দাও।

এখন কোনমতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছাড়া এ তীক্ষ্ণ তীব্র চিন্তা-যন্ত্রণা থেকে তার কোনমতেই অব্যাহতি নেই। সে আর পারছে না।

ওরই মধ্যে দু-একবার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে, সে লেখা-পড়া জানা মেয়ে, আধুনিকা বলেও দাবি করে—অন্তত বেশে-ভূষায় আচরণে আধুনিকা হবার চেষ্টা করে—এই বয়সে জগতের সংসারের অনেক কিছু দেখেছে—ওর এই অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মতো দুর্বলতা বা আকুলতা শোভা পায় না।

কিন্তু এসব যুক্তি মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে বুঝি পৌঁছয় না—চিত্ত অন্য বস্তু, সেখানে সবাই সমান।

বঙ্কিমচন্দ্র জেবুন্নিসার চিত্রে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন। বাদশাজাদা প্রেমকে উপেক্ষা করে ওঁর মণিমাণিক্যখচিত পয়জার তার মাথায় রাখতে চেয়েছিলেন—তার ফলে ওঁকেও ওঁদের সাধারণ দরিদ্র প্রজার মেয়ের মতোই 'বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনা' হয়ে মাটিতে পড়ে বিলাপ করতে হয়েছে, হাহাকার করতে হয়েছে।

একি ওর অহঙ্কারের ফল!

এখনও বয়স সম্ভাবনা কিছুই পার হয় নি।

এই তো কদিন আগেই মুকুট সেই কথাটা পাড়তে গিছল।

বলেছিল 'চাকরি না ছাড়তে চাও, এসো একটি সন্তানকেই ডেকে আনি আমরা—আমাদের এই ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করতে—তাহলেই তোমাকে নিয়ে এ টানাটানি থাকবে না—শান্তি পাবে, শান্ত হবে।'

তার উত্তরে কঠিন বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিল রুমা, 'ইউ কান্‌ট হ্যাভ ইট বোথওয়েজ। দুধ আর তামাক একসঙ্গে খাওয়া যায় না।'

নিজেই সে নিজের সর্বনাশের ব্যবস্থা করেছে।

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির, পূর্ণ শান্ত জীবনের সম্ভাবনা নিজে হাতে নষ্ট করেছে।

'দর্পহারী মধুসূদন কারও দর্প রাখেন না'—তার মা এই কথাটা প্রায়ই বলতেন না ?

বেহুঁশ হতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। উগ্র তথাকথিত-মদ আকণ্ঠ গিলেছে সে বসে বসে।

এই শ্রেণীর দোকানের কথা সে জানে, এদের এই পানীয়ের মধ্যে মদ ছাড়াও কিছু থাকে।

তা জেনেও খেয়েছে অথবা না জেনেই খেয়েছে।

তা হোক, তার তখন কোনো কিছুর কথাই ভাবার অবসর ছিল না।

সে অজ্ঞান হতে চায়। নিজের কাছ থেকে পালাতে চায়।

স্কুটার কোন্ পথ দিয়ে কোন্ পাড়ায় যাচ্ছে—হুঁশ থাকলেও—রাত্রের স্বল্পালোকিত পথ, দোকান-বাজার খোলা না থাকলে পথ প্রায় অন্ধকার থাকে—চিনতে পারত না।

হুঁশ তো ছিলই না। তাই স্কুটারওয়ালা যে অনেক ধুরে একেবারে একটি জনহীন বসতিহীন পথে—ডি. ডি. এ-র একটা বস্তি-ভেঙে-ফেলা খালি মাঠের ধারে এনে দাঁড় করিয়েছে—তাও বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পারে নি—আরও অনেক কিছুই।

তরুণ স্কুটারওয়ালা গুরুবক্স সিং শুধুই অল্পবয়সী বা সুশ্রী নয়—তার দেহেও বেশ শক্তি। তার এই আধ-ময়লা, ঘামের-গন্ধে-অসহনীয় জামা আর ধূলি-

মলিন প্যান্ট ছাড়িয়ে ভালো জামা-কাপড় পরালে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে বলেই মনে হবে।

হয়ত তাই-ই। লেখাপড়া তেমন হয় নি বা চাকরি পায় নি, কিংবা ভালো কোনো ব্যবসা করার মতো সঙ্গতি ছিল না বলেই এই কাজ নিয়েছে। পরে খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল—মুকুট অনেক টাকা খরচ ক'রে খোঁজ নিয়েছিল—স্কুটারটা ওর নিজেরই, মামার দেওয়া টাকায় কেনা।

গুরুবক্স সিং এসব কিছুই জানত না।

তার তখন যৌবনতৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে।

যে কাজ করে নি কখনও তারই ঈপ্সা আর বিবেকে মিলে প্রবল একটা ঝড় তুলেছে মনে। মাথা আর কাজ করছে না, বুদ্ধি বা বিবেচনা তার অধীনে ছিল না সে সময়।

সেও আর এক রকমের বেহুঁশই হয়ে গিয়েছিল।

এতখানি খোলাপথে গাড়ি চালিয়ে এসেছে, প্রচুর হাওয়া চারিদিকে—তবু সমস্ত কপাল, পাগড়ির প্রান্ত ভিজে গেছে ঘামে, গলা এমনকি খোলা দুটো হাত দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। হাওয়াই শার্টটার দুর্গন্ধ আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

অবশেষে কামনারই জয় হলো। অল্প বয়সে তা-ই হয় বেশির ভাগ।

সে সযত্নে রুমার শিথিল দেহটা গাড়ি থেকে নামিয়ে পথের ধারে শুইয়ে দিলো। ততক্ষণে হাতের মধ্যে তুলে, ঐ সুরদুর্লভ দেহটার স্পর্শ পেয়ে সে ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে।

হাত কাঁপছে থরথর করে—যে প্রচণ্ড কামনার জন্যে এ উত্তেজনা তা পূরণের শক্তিও থাকছে না বুঝি ঐ উত্তেজনা ও ব্যগ্রতার জন্যেই—।

একেবারে শেষ মুহূর্তে চৈতন্য ফিরেছিল একটু রুমার। ঝাপসা ঝাপসা ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিল।

কিন্তু তখন বাধা দেবার মতো শক্তি বা উপায় আর ছিল না।

বোধহয় ইচ্ছাও না।



সাধারণ লোকের এ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে মাস তিনেক সময় লাগে। কিন্তু যে ডাক্তার—বিশেষ এই বিষয়েই যার বিশেষ শিক্ষা—সে দু মাসেই টের পাবে বৈ-কি।

রুমাও টের পেল।

বুঝল তার উন্মত্ততার পরিমাণ আর পরিণাম।

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা প্রায় বন্ধই হয়েছিল।

সে রাত্রের ঐ ঘটনার পর থেকে। মুকুটের মনে হয়েছিল এই চাকর আর আয়াকে পরের দিনই জবাব দিয়ে যেখান থেকে হোক অন্য লোক নিয়ে আসবে—কিন্তু মাথা আর একটু ঠাণ্ডা হতে বুঝল সে আরও নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

এখানে চাকরি বজায় থাকলে—রাখতে হলে তারা তবু একটু সামলে থাকবে, কারণ সাহেব-মেম কেউই যেখানে সংসার দেখেন না, সেখানে এ চাকরি লাভজনক—কিন্তু বিদায় দিলে কতকটা সেই আক্রোশে সমস্ত পরিচিত সমাজে কুৎসা ক'রে বেড়াবে।

অন্যত্র যেখানে কাজ পাবে শুধু সেখানেই নয়, মুকুটের রুমার বন্ধু-পরিচিত মহলে তাদের যাতায়াত আছে— অবসর সময়ে যেচে উদ্যোগ ক'রে গিয়ে এই মজাদার 'কিস্‌সা' শুনিয়ে আসবে।

এ অশিক্ষিত লোক বলে নয় সমগ্রভাবে মানব-মনেরই ধর্ম।

একান্ত স্বাভাবিক।

কাজেই কিছুই বলা যায় নি তাদের – 'এসব কথা কাউকে বলো না,' তাও বলতে পারে নি।

সেটা আরও লজ্জার আরও নির্বুদ্ধিতার কাজ হত—কিন্তু তারপর থেকে আর তাদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে কথা বলতে পারে না মুকুট, নিজের

সংসারে নিজে চোর হয়ে থাকে।

কেবল রুমাই কেমন যেন নির্বিকার। তার সমস্ত আচরণেই একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভাব। মনে হয় কেউ কিছু বলতে আসুক সেইটেই সে চাইছে, উত্তরে কতকগুলো কড়া কড়া কথা বলতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। অন্তরের জমে থাকা বহুদিনের বিষবাষ্প বেরিয়ে গেলে সে বাঁচে।

সে বিষ বাইরে যাবার পথ না পেয়ে নিরন্তর তাকেই দগ্ধ করছে।

তবে তা হয় নি। মুকুট কোনো প্রশ্ন করে নি, কোনো কৈফিয়ৎ চায় নি। সে বরং আরও নির্বাক হয়ে গেছে।

শুধু তার নিদারুণ মানসিক আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠেছে কপালের একটির পর একটি স্থায়ী রেখায়।

কথা কইল রুমাই প্রথম।

নিজের অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে শান্ত, নিঃসঙ্কোচ মুখে নির্ঘাত সংবাদটা দিলো মুকুটকে।

তার স্বাস্থ্য যে এত ভালো তা মুকুট এতদিন এভাবে জানতে পারে নি।

এই সংবাদে সেই মুহূর্তেই তো হার্ট য়্যাটাক হবার কথা।

তবু, একটু সময় লেগেছিল সামলে নিতে।

প্রায় দশ মিনিট বিমূঢ়ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে—কথাগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছিল ; সেই সঙ্গে রুমা তামাশা করছে বা মিথ্যা বলছে কিনা—সেটাও।

সেইটেই সে তখন আশা করছিল, একাগ্রভাবে কামনা করছিল।

হে ভগবান, ও বলুক এ মিথ্যা, এ তামাশা, এ শুধু মুকুটের দুষ্কৃতিকে তিরস্কার করার একটা চেষ্টা।

অপেক্ষাও করছিল বুঝি সেইজন্যেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে বাধ্য হয়েছিল ঐ মর্মান্তিক তথ্যটা সত্যই।

তারপরই এতদিনের সহ্যের বাঁধ যদি ভেঙে থাকে তো মুকুটকে দোষ দেওয়া

যায় না।

কুৎসিত কতকগুলো কটূক্তি ক'রে উঠেছিল। বেশ কিছু কদর্য গালাগাল, যথোচিত ইতর অঙ্গভঙ্গী সহকারে, খিস্তি যাকে বলে—যা কোনো শিক্ষিত লোকই সহজে উচ্চারণ করতে পারে না—অথচ জনপদে বাস করার জন্যে কানে যায় সকলকারই—বহুবারই শোনে।

হয়ত এইভাবে চেঁচামেচি করার জন্যেই মর্মঘাতী আঘাতটা জীবনঘাতী হতে পারে নি।

রুমা চুপ ক'রে বসে শুনেছিল। স্থির শান্ত দৃষ্টিতে চেয়েছিল স্বামীর মুখের দিকে।

সে চিকিৎসক, সে জানে জ্বালাটা বেরিয়ে যেতে দেওয়াই উচিত। অন্তরের বাষ্প বেরিয়ে যাবার পথ না পেলে ভেতরেই ফেটে যায়।

তারপর বোধ করি নিশ্বাসের অভাবেই মুকুট চুপ ক'রে এলে বলেছিল, 'চেঁচামেচি ক'রে কোনো লাভ তো নেই—মিছিমিছি যাদের উপহাসের পাত্র হওয়ার এত ভয় তোমার—তাদের কাছেই আরও ছোট, আরও উপহাসের পাত্র হয়ে যাবে। ··আমরা অনেকদিনই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি—এখন অন্তত বাইরে হাসিমুখ বজায় রেখেই বিদায় নেওয়া ভালো নয় কি। এতদিন কখনও চেঁচামেচি করো নি—আজ এই শেষ মুহূর্তে এমন করছ কেন?'

সেকথা বোধহয় কানেও গেল না মুকুটের, গেলেও সে কথাগুলোর পূর্ণ অর্থ বুঝল না, বিষতিক্ত কণ্ঠে বললো, 'তা এ সন্তানের জনকটি কে? সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী না কি স্বয়ং কর্তা?'

রুমা এবার বোধ করি প্রচণ্ডতম মারণাস্ত্রটি প্রয়োগ করল। এখনও পর্যন্ত মুকুট যে অবলম্বন ধরে ছিল, তাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে বললো, 'না, তারা কেউই না। কে তা আমি জানি না। আমি জ্ঞানে কোনো পুরুষের কাছে দেহটা বিকিয়ে দিই নি—এটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।'

আরও ক মিনিটের একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

তারপর মুকুট শিথিল ভগ্ন কণ্ঠে বললো, 'তা—তার মানে? তাহলে অজ্ঞান

অবস্থায়—মানে তাহলে কি বলতে চাইছ, সেদিনের সেই মাতাল অবস্থায় কেউ—? তাহলে কি সেই স্কুটারওয়ালা—?'

'সম্ভবত। আমার তাই মনে হয়। তবে হলপ ক'রে বলতে পারব না।'

'সেই ছোটলোকটা! তুমি শেষে এই স্তরে নেমে এলে। ঐ নিরক্ষর রিক্‌শাওয়ালাটা!'

'আবার তুমি ভুল করছ। জ্ঞানত এটা ঘটলে আমার নেমে আসার কথা উঠত। এখানে তো আমার নির্বাচনের প্রশ্নই ছিল না। ছোটলোক কি ভদ্রলোক, কিছুই জানি না। আর যে এ কাজ করতে পারে সে যতবড় চাকরিই করুক, সে আর ভদ্রলোক থাকে কি? যদি আওার সেক্রেটারী এ কাজ করতেন—আমি তাঁকে ঐ স্কুটারওয়ালার চেয়েও নিম্নস্তরের জীব ভাবতুম। কারণ এ লোকটা মূর্খ, ছোট কাজই করে। তার বেলা তো সেটুকু কৈফিয়ৎও থাকত না।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মুকুট বলে, 'আমার যত টাকাই খরচ হোক—তাকে খুঁজে বার করব। তাকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব—।'

মুকুট তখন যেন পাগলই হয়ে উঠেছে।

চিন্তা অসম্বদ্ধ, কথা অসংলগ্ন।

কি বলছে তা কি সে নিজেই জানে? রুমাও তা বুঝল। সে তেমনি শান্ত ভাবে—কতকটা ছেলেমানুষকে সংযত করার মতো ক'রেই বললো, 'কী পাগলামি করছ। পাঁকে ঢিল ছুঁড়লে সে পাঁক ছিটকে নিজের গায়ে আসে। এ নিয়ে কেস হলে তুমি আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে? পথে ঘাটে বেরোতে পারবে? তাছাড়া তার প্রমাণ কৈ? সাক্ষী কে?'

'ডাক্তারী পরীক্ষা করা যায়।' তবুও মুকুট জিদ করে।

'সেও অনেক ঝঞ্ঝাট, লোক জানাজানি। তার চেয়ে আমাকে ত্যাগ করো—সুখী হতে না পারো নিশ্চিন্ত হতে পারবে। অন্য কাউকে পেয়ে সুখীও হতে পারো। মামলা করার দরকার তো হবে না, কাগজপত্র যা বলবে সব সই ক'রে দেবো। আমার তরফ থেকে কোনো অসুবিধেই ঘটবে না তোমার।'

খুব সহজ, খুব নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে রুমা।

আবারও একটা সেই রকম প্রচণ্ড আঘাত। মনে হলো সত্যিসত্যিই কঠিন কোনো বস্তু দিয়ে তার বুকে বুঝি আঘাত করল কেউ।

এরকম তো মুকুট ভাবে নি, এ সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয় নি তার।

রুমাকে ত্যাগ! না না! সে হয় না!

এ যা হয়েছে তার জন্যে প্রধানত দায়ী মুকুট নিজেই—তাতে তো সন্দেহ নেই। প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে তাঁকেই করতে হবে।

তাই সে চরম মহত্ত্ব হিসেবেই আশ্বাসদানের সুরে বললো, 'না না, ওসব কথা উঠছে কেন। আমি তো সেভাবে বলি নি। এটাকে—এটাকে নষ্ট ক'রে দাও—তারপর একবার—এ তো তুমি নিজেই পারবে—রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে নাও, কোনো খারাপ অসুখ ও লোকটার ছিল কিনা দেখা দরকার—তারপর আমাদের সন্তান—'

রুমা একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'না, সন্তান আমি নষ্ট করতে পারব না। আমার গর্ভের প্রথম সন্তান। যেভাবে যার দ্বারাই আসুক—সে নিরপরাধ, তাকে আমি খুন করতে রাজী নই। আমার একটা সরকারী ভ্রমণ ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই হয়ে আছে। সুইডেন, সুইৎসারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড হয়ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেও যেতে হতে পারে। সরকারী টাকা ছাড়াও ফরেন একস্‌চেঞ্জ যোগাড় করতে পারব। ওখানেই কোথাও বাচ্চাটা হবে, তারপর যদি কাজকর্ম কিছু যোগাড় ক'রে নিতে পারি আর ফিরব না। যদি ফিরতে ইচ্ছা হয়—ছেলে বা মেয়ে যা হবে তাকে নিয়েই ফিরব।'

এ আঘাতও সামলাতে কিছু দেরি হলো।

কিন্তু অকারণ আঘাত খেতে খেতে মুকুটেরও গর্তের ব্যাঙের অবস্থা হয়েছে তখন, সে ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'কী পরিচয় দেবে তার? ঐ জারজ সন্তানটাকে আমার বলে কোলে ক'রে বেড়াতে হবে?'

'জারজ কি গো!' তেমনি সমান বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিলো রুমা, 'মহাভারত পড়ো নি? ক্ষেত্রজ সন্তান। শাস্ত্রে আছে এর ব্যবস্থা, পড়ে দেখো। ও দেশে

হলে তোমার মাথায় শিং খুঁজত—এ দেশের শাস্ত্রে সে তোমার পিণ্ডাধিকারী হতে পারবে স্বচ্ছন্দে। আমাদের শাস্ত্র খুব উদার। কানীন, সহোড়—সবরকম সন্তানকেই স্বামী পিতৃ-পরিচয় দিতে বাধ্য।'

বিষবাষ্প তার অন্তরে আছে বৈকি !

বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ, গ্লানি।

প্রিয়তম স্বামী সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অভিমান আর অভিযোগ।

সর্বনাশা অভিমানে এ যে তার সর্বনাশ করারই অভিযান, এ কথাটা সে বোঝাবে কাকে ?

কেউ বুঝি বুঝবে না এ জ্বালা এই আগ্নেয়গিরির অভ্যুত্থান-পূর্ব অবস্থা। এই প্রথম অবসরেই তাই সে তরল অগ্নির এক ঝলক বেরিয়ে পড়ে—পূর্ণপাত্র চল্‌কে ওঠার মতো।

তবু, স্বামীকেও সে ভালবাসে। যথার্থ ভালবাসে বলেই বুঝি এত অভিমান।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাই অনুতপ্ত হয়ে ওঠে তার মুখের দিকে চেয়ে। সেজন্যে একটু থেমে বোধ করি চেষ্টা ক'রেই গলাটা স্বাভাবিক ক'রে এনে বললে, 'অত ভাবছ কেন—আমি দু বছর বাইরে কাটিয়ে এলে তুমি সেই অজুহাতেই আমাকে ত্যাগ করতে পারবে। আমি আর তুমি এক শহরে না থাকলে তার পিতৃ-পরিচয়টাও এত তোমাকে আঘাত করবে না।'

আর দাঁড়াল না রুমা। তার আপিস আছে।



রুমা সত্যি সত্যিই ইউরোপ চলে গেল।

ওদের নিজস্ব বিভাগ থেকে একটা ছোট্ট ডেলিগেশ্যন মতো যাচ্ছে। দু-তিনজন বিভাগীয় কর্তা-পুরুষ আর একটি মহিলাও। শোভনতার দিক থেকে কোনো 'কথা' ওঠার প্রশ্ন রইল না।

রুমা যে আর সহজে ফিরবে না—সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রইল না আর মুকুটের মনে।

সে বৃথা ভয় দেখায় নি।

সে চিরজীবনের মতোই ওকে ত্যাগ ক'রে গেল।

মুকুট যে কাজ করতে পারত না সে অনায়াসে করল, সে-ই ত্যাগ করল স্বামীকে।

এরপর আর মুকুটের দিল্লীতে থাকা সম্ভব নয়। রইলও না।

সেও চাকরি ছেড়ে দিলো।

এ বাড়িও আর রাখার মানে হয় না, এত টাকা ভাড়া টানার।

আসবাব সবই বেচে দিলো সে। ভালো ভালো আসবাব, জলের দামে বললে কম বলা হয়—ঘোলা জলের দামে বিক্রি করল একরকম।

এর মধ্যে অনেক জিনিস রুমার বাবার দেওয়া, রুমার নিজের কেনা শখ ক'রে—নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে, তাও আছে—সেগুলো বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার ওর আছে কিনা সে সম্বন্ধে মনে একটু দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, একটু সংশয়—কিন্তু তার পরই মন শক্ত ক'রে নিয়েছিল।

সব তো ছেড়েই দিয়ে গেছে যখন, আর আসবে না, অন্তত ওর ঘরে ওর সঙ্গে বাস করবে না সে বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা রেখে যায় নি—তখন এ আসবাব খামকা কোথাও গুদামজাত ক'রে রেখে লাভ কি ?

সে সবই বিক্রি ক'রে দিলো।

শুধু এইসব আসবাব ইত্যাদি বিক্রির টাকাটা আলাদা ক'রে একটা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রেখে দিলো—যদি কখনও আবার যোগাযোগ হয় কি রুমা অর্থকষ্টে পড়ে তো তার কাজে লাগতে পারে।

তার উইলেও সেই মতো লিখে ব্যাঙ্কের জিম্মায় রেখে দিলো।

ওর মৃত্যুর পর যদি কিছু থাকে, যা থাকবে —রুমার খোঁজ ক'রে যেন তাকে দেওয়া হয়।

অর্থাৎ জীবনের একটা পর্বে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলো একেবারে।

একটা পর্ব—কিন্তু সাধারণ কোনো একটা নয়।

জীবন বলতে সে যা বুঝত, অন্তত এতকাল বুঝে এসেছে—তারই শেষ হয়ে গেল, সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটল।

প্রেমময়ী স্ত্রী, সুন্দর মেধাবী সন্তান, সুখের নীড় একটি গৃহ। এই তো মানুষ কামনা করে, এই তো তার জীবন।

সে জীবনের সম্ভাবনা এ জন্মে আর রইল না।

অতঃপর দেহটাকে টেনে বেড়াতে হবে এই মাত্র।

যদি অন্য কোনো ধরনের জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা খুজে না পায়।

তারপর থেকেই সে ঘুরছে।

কলকাতায় আর ফেরে নি। বাড়ির ভাড়া ব্যাঙ্কে জমা হয় সোজাসুজি। ভাড়াটেরা ভালো ; মুকুটও যেমন ভাড়া বাড়ায় না, তাঁরাও তেমনি টাকা ফেলে রাখেন না—ছোটখাটো মেরামত নিজেরা ক'রে নেন, ট্যাক্সও তাঁরাই দেন।

অর্থাৎ পিছটান আর কোথাও কিছু রইল না।

সংসারের সাধ মিটে গেছে তার। সংসারে আর ফিরবে না।

শুধু জ্বালাটা রইল।

সেই কারণেই প্রতিজ্ঞা করেছে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে না, স্ত্রী যদি করে তো করুক।

তবে তারও অজুহাত পাওয়া শক্ত। অত সহজে পারবে না।

ব্যভিচার ক'রে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হবে তাকে, সসম্মানে বিয়ে ক'রে আবার সুখে দাম্পত্য জীবনযাপন করতে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

তবে এ জ্বালাটুকুও, এ বিষজর্জরতাও হয়ত থাকবে না একদিন। আজকের এই প্রতিশোধস্পৃহা সেদিন হাস্যকর মনে হবে।

সে শান্তির সন্ধানেই বেরোচ্ছে—মনকে শান্ত, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত করতে।

শুনেছে ঈশ্বরে-সমর্পিত-প্রাণ না হলে এ শান্তি আসে না। নির্মল আনন্দ পায় মানুষ তাঁর আসন বুকে পাততে পারলে।

এই বাসনা কামনা, জ্বালা, বিদ্বেষ, হতাশা আর অনুতাপ যদি তাঁর পায়ে সঁপে দিতে পারে—তাহলেই পরম শান্তি আসবে, শান্ত হবে মন।

সেই চেষ্টাই সে করবে।

মানুষ আর নয়, সংসারের শখ তার মিটেছে—সে এবার থেকে ঈশ্বরকেই খুঁজবে।

তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। তীর্থে তীর্থে ঘুরছে।

গুরু চাই।

এটুকু যা পড়াশুনো ক'রে, লোকের সঙ্গে আলোচনা ক'রে বুঝেছে—অনেক ধার্মিক প্রবীণ লোকের দেখা পেয়েছে এই যাত্রায়, যাদের দেখলে ভক্তি হয় এমন লোকের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছে—ঈশ্বরকে পেতে হলে অথবা তাঁর জন্য সাধনা করতে হলেও সৎ গুরু চাই।

গুরু না হলে কেউ সে পথ দেখাতে বা সেখানে পৌঁছে দিতে পারবেন না, নির্মল আনন্দলোকে, গভীর শান্তিস্বরূপে।

সেই গুরুই খুঁজছে মুকুট।

পাণ্ডুরঙ্গজীর মন্দিরে একবার এক প্রবীণ সাধুকে দেখে ওর খুব ভক্তি হয়েছিল।

প্রশান্ত দীপ্তিময় আনন, বিভূতি আচ্ছাদিত রেখাশূন্য ললাট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে নিয়ত ঈশ্বরের নাম—ঠোঁট দুটি নড়েই যাচ্ছে—একই

শব্দ উচ্চারণে তা বেশ বোঝা যায়। হাতে মাত্র একটি কমণ্ডলু।

মন্দিরের বাইরে তিন দিন ধরে বসে আছেন—ওঠেনও না, কিছু খানও না—এমনকি স্নানাদি করতেও যান না, অনেকের মুখেই শুনল।

তাঁর পায়ে পড়েছিল মুকুট।

হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবী বলে বোধ হতে হিন্দীতেই তার প্রাণের আকুতি জানিয়েছিল, ও তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চায়।

তার উত্তর তিনি পরিষ্কার বাংলায় দিয়েছিলেন, 'আমি তো বাবা কাউকে দীক্ষা দিই না। যিনি দীক্ষা দেবেন তিনি সেইদিন থেকে শিষ্যর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যে দায়ী হবেন—আমি আমার গুরুর কাছ থেকে এই কথাই শুনেছি। সে শক্তি আমার নেই, এখনও অর্জন করতে পারি নি। তবে তুমি এমন ক'রে হন্যে হয়ে ঘুরো না বাবা, একটা কথা বলে দিচ্ছি—এখন তোমার সময় আসে নি সে গুরু লাভের। তুমি উত্তর ভারতে যাও। হিমালয়ে বা তার সানুদেশে কোথাও তাঁর দেখা পাবে। তোমার যিনি গুরু তিনি তোমার কাছে রিভীল্‌ড্‌ হবেন। তাঁকে দেখেই চিনতে পারবে, মন বলে উঠবে এই, এঁর জন্যেই এতদিন প্রতীক্ষা করেছি।'

এই বলেই তিনি যে মৌনী হয়েছিলেন, আর একটি কথাও বলাতে পারে নি মুকুট।

সবচেয়ে ওর বিস্ময় এই বাংলা কথা শুনে।

তবে কি উনি বাঙালী সাধু?

'দীক্ষা' শব্দটা 'দীক্‌ষা' এইভাবে উচ্চারণ করছিলেন বটে—তবে বাকি সব কথাই নির্ভুল, অনভ্যাসের টান শূন্য।

সেই কথাই জানতে চেয়েছিল মুকুট, 'বাবা, তবে কি আপনার বাঙালী শরীর?'

তাতে শুধু একটু মুচকি হেসেছিলেন সাধু, উত্তর দেন নি।

তারপর থেকেই হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে ঘুরছে।

বিখ্যাত সব তীর্থেই সে গেছে। এমন কি কোনো কোনো স্বল্পখ্যাত নির্জন তীর্থেও।

শুনেছে সে যথার্থ সাধুরা লোকালয়—তার কোলাহল আর বিষ-সংসর্গ পরিহার ক'রে চলেন।

দেখা পেয়েওছে দু-চার জন যথার্থ তপস্বীর। যাঁদের কৃচ্ছ্রসাধন বিস্ময়কর কিন্তু সেটা তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। জনতার প্রণামে তাঁদের লোভ নেই।

এই তো যথার্থ সাধুর লক্ষণ।

তবে সেই গুরুকে যেন তবুও খুঁজে পায় নি। এতদিন পরে সেই সাধুর কথা ফলেওছে, নিজের গুরু ওর কাছে প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত হয়েছেন—যাকে তিনি বলেছিলেন 'রিভীলড' হওয়া কিন্তু তবু সব ভেস্তে যাচ্ছে যে, এতদিনের সব আশা, সব কল্পনা।

সন্ন্যাস হবে না তার!

সংসারে ফিরতে হবে!

সেই অসংখ্য গ্লানি, অসংখ্য অশান্তির মধ্যে। দুঃখ ও জ্বালামাত্র যে সংসার দিতে পারে মানুষকে!

হে ঈশ্বর, এ তোমার কি নিষ্ঠুর বিধান ওর জন্যে।

৭

শান্তি রুমাও পায় নি, সুখও না।

পাবে বলে আশাও করে নি।

কারণ নিজের মন সে জানত।

তবে তার আর এদেশে ফেরার ইচ্ছা ছিল না। স্বামীর প্রতি অভিমান ক'রে সে যেভাবে নেমে এসেছে—নেমে এসেছে, মানে তার নিজের বিবেকের মানদণ্ডে এটাকে নামাই বলে—তার চরমতলও পেয়ে গেছে বোধহয়—তার জন্য সেও মনে মনে কম দগ্ধ হচ্ছিল না, অনুতাপ তার নিজেরও কম হয় নি।

সেই কারণেই সে স্থির করেছিল এদেশে আর আসবে না। এখানে এলেই সে খবর একদিন না একদিন মুকুটের কাছে পৌঁছবে—তার লজ্জা ও অপ্রতিভতার কারণ হবে।

পুরনো স্মৃতির জ্বালায় নতুন ক'রে জ্বলবে।

সে যদি আর কোনোদিনই না ফেরে তাকে কেন্দ্র ক'রে কোনো 'এমব্যারাস-মেন্ট'-এর কারণ ঘটবে না।

কীই বা বয়স মুকুটের। হয়ত আবার কোনো এমন সঙ্গিনীর সন্ধান পাবে—যে ওকে শান্তি দিতে পারবে, সন্তান দিতে পারবে। তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না।

না হলেও চলবে, মুকুট এটুকু বুঝবে যে, রুমা কোনোদিন এসে ওর নামে মামলা করবে না।

সেই মতোই আয়োজন করেছিল সে।

সরকারী দপ্তর বাধ্য থাকায় ফরেন কারেন্সীর অভাব হয় নি।

অনেক টাকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পেরেছিল সে। এ যাত্রায় তো কোনো খরচই লাগবে না, ওখানে গিয়েও কোনো চাকরি জুটিয়ে নিতে অসুবিধা

হবে বলে মনে হয় না।

সন্তান—ছেলে বা মেয়ে যাই হোক—তাকে মানুষ করার মতো উপার্জন করতে পারবে।

কিছু টাকা অবশ্য এখানে রইল ব্যাঙ্কে, যদি নিতান্ত কোনোদিন বাধ্য হয়ে ফিরতে হয় বা ছেলে ফেরে, সে টাকায় এখানে এসে অন্তত কিছুদিন দাঁড়াতে পারবে।

ভিসাও এমনভাবে করিয়ে নিলে যে, ওখানে বেশ কিছুদিন থাকলেও আটকাবে না।

চাকরি যখন পাবে তখন হয়ত আধ একটু পালটাতে হবে সে ভিসা—তবে তার অসুবিধা যাতে না হয় এখানকার মন্ত্রীকে দিয়ে সেইমতো একটা চিঠিও লিখিয়ে নিল।

প্রথম মাস-দুই ভালোই ছিল।

ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম—ভালোভাবেই ঘুরে দেখেছে।

ওর জন্য বরং সঙ্গী-সঙ্গিনীরাই চিন্তিত ছিলেন বেশী, সতর্কতাও যথেষ্ট নিয়েছিলেন—কিন্তু রুমা শরীর খারাপ হতে দেয় নি।

এই 'গর্ভভারনত' অবস্থা ওর একটা আত্মরক্ষার বর্মও হয়েছিল। নইলে হয়ত ওপরওলার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হত এক-আধ রাত।

যে যে দেশে গেছে সেখানের কেউও যে ওদিকে কিছু অগ্রসর হয় নি তা নয়, ঐ একই কারণে তাদের হার মানতে হয়েছে।

অবশেষে যখন সরকারী কাজ বা কাজের অছিলা শেষ হলো, দেশে ফেরার পালা এলো—তখন সে কিছুদিন বিশ্রামের অজুহাতে সুইৎসারল্যাণ্ড চলে গেল।

হ্রদের ধারে একটি মনোরম পার্বত্য বিশ্রামনিবাসের ছবি দেখে খুব ভালো লেগেছিল। সেইখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছিল আগে থাকতে। কোনো অসুবিধাই হলো না।

সরকারী টাকাও আইনমতো যতটুকু নেওয়া যায় সেটা আদায় ক'রে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই চলে গেল।

ডলার যা আছে—তাতে বছর দুইয়ের মধ্যে কোনো সংকটে পড়তে হবে না।

এ পর্যন্ত তার, যাকে বলে পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই কাটল।

সুখী না হলেও তাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল, ভেবেছিল জীবনের বহিরঙ্গ দিকে অন্তত কোনো অশান্তির কারণ ঘটবে না।

এতদিন প্রায় ঝড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলেই চিন্তা বা অনুশোচনা অতটা পীড়িত করতে পারে নি।

তবু, কিছুটা চিন্তা ছিলই।

বাবা, মা, ভাই, দেশ—সব চেয়ে মুকুট।

অভিমানে অন্ধ ছিল বলেই হোক, অথবা মুকুটের ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল বলেই তাকে উপর্যুপরি যে সব কঠিন আঘাত দিয়েছে, দিতে পেরেছে, এখন তার স্মৃতি যেন কঠিনতর হয়ে বাজছে ওর বুকে।

'থেকে থেকেই উন্মনা হয়ে যাচ্ছে কেন' সহযাত্রী বা সহকর্মীদের এ প্রশ্নের উত্তরে তামাশা করারই চেষ্টা করেছে—'বরের জন্যে মন কেমন করছে'—সেটা যে নির্ঘাত সত্য, ওর অন্তরের কথা, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি, যদিও সেই সুরেই ভাসাভাসা তামাশা করেছেন।

কি আশ্চর্য, তখন কি সত্যিই অন্ধ হয়ে ছিল রুমা?

অভিমান?

অভিমানে মানুষকে অন্ধ ক'রে দেয়—এটা শুনেছে সে।

কিন্তু সে অন্ধত্ব কি নিজেকেও দেখতে দেয় না?

নিজের সুখ দুঃখ ভবিষ্যৎ তো তুচ্ছ—নিজের মনটাও দেখতে পায় না সে অন্ধ?

মোহান্ধ, ভাগ্যান্ধ, হতভাগ্য মানুষটাকে!

তবে আজ কেন যে বিগত জীবনের প্রতিটি দিনের কথা এমনভাবে মনে পড়ছে?

মুকুটের শুষ্কমলিন মুখে, এক-একটা আঘাতের যে দুঃসহ বেদনা প্রকাশ

পেয়েছিল, তা সেদিন ওকে সচকিত ক'রে দেয় নি কেন ?
ওর অত সুন্দর স্বামীর মসৃণ ললাটে যে একটি স্থায়ী রেখা ফুটে উঠেছে, দিনে দিনে অকালে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তা দেখেও পাষাণীর বজ্রকঠিন হৃদয়ে একটুও মমতা জাগে নি তো !
মুকুট যে তাকে কী প্রচণ্ড ভালবাসে— জ্ঞানহীন উন্মত্তের মতো, তা কি সে সেদিন বুঝতে পারে নি— একটির পর একটি অমার্জনীয় অপরাধ ক্ষমা করছে দেখেও।

তবু, সরকারী সফরের দিনগুলিতে এরা ছিল বলেই, এতটা দুঃসহ হয়ে ওঠে নি এসব চিন্তা, এমন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে নি।
তখন ভেবেছে যে, একটু নির্জনতা পেলে বাঁচে, একটু একা থাকতে পেলে বেঁচে যায়—এখন দেখল যে সেটা ভাবার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছু ছিল না।
আজ সে প্রথম জানল, বুঝল—নির্জনতা মানে জনহীনতা নয় শুধু।
বহুমানবের মধ্যে থেকেও একরকম নির্জনতা ভোগ করা যায়।
যাদের কথাবার্তা কোলাহল ওর গোপন চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না —অথচ একটা আশ্বাস বহন করে।
আত্মরক্ষার একটা প্রাথমিক বর্মে ঢেকে রাখে অনেক ভাগ্যতাড়িত হত-ভাগ্যকে।
নির্জনতার আসল যে'জন'—যাকে এড়াতে চায় মানুষ সে তো তার মন — চিন্তা। কৃতকর্মের জন্য আকুল অনুতাপ।
বাইরের এই নির্জনতা যে এমনভাবে তার মনের টুঁটি টিপে ধরবে, এমন-ভাবে জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসবে তা কে জানত !
এতদূরে বাঙালী তো কেউ নেই-ই, ভারতীয়ও আর কেউ নেই।
অধিকাংশই অ্যামেরিকান, কিছু ইউরোপীয়ান।
ভিন্ন দেশের রাজনীতিকের দল এসেছেন গোপন পরামর্শ কি ষড়যন্ত্র করতে, কিছু ব্যবসায়ী এসেছেন গোপন উপার্জনের সদ্‌গতি করতে।

দু-একটি অধ্যাপক এসেছেন নিছক বিশ্রাম করতেই—*কিন্তু এঁদের আধি-*
কাংশই ইংরেজী জানেন না। যে সব অতিথি ইংরেজী জানেনও তাঁরা নিজেদের কাজে (বা অকাজে) এত ব্যস্ত যে, অলস আলাপের অবসর পান না। দেখা হলে শুধু মাথা হেলিয়ে চলে যান।

ফলে, অপর কোনো লোকের সঙ্গে কথা কইতে না পারার জন্যে নিজেকেই যেন সর্বদা কান পেতে শুনতে হয় নিজের মনের কথা, বিবেকের তাড়না ও তর্জন।

মুকুটের প্রতি সে রীতিমতো অবিচারই করেছে, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়েছে তাকে।

মানুষের অনেক উচ্চাশা থাকে, কারও উচ্চাশা যদি স্ত্রীকে বড় চাকরিতে অধিষ্ঠিত দেখেই সার্থক হয়—তাকে কতটা দোষী করা যেতে পারে?

যেভাবে সে মানুষ হয়েছে, যে সমাজে যে পরিবেশে বাস করছিল তাতে এ ধারণা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে এতখানি আহত বোধ করার কোনো অধিকার কি সত্যিই ছিল রুমার?

বিশেষ সে লোকটা যে ওকে ভালবাসত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না তার।

বরং বেশীই ভালবেসেছিল, বিচার-বিবেচনার দিকে চোখ বুজে।

স্ত্রীর যে আচরণ কোনো স্বামী ক্ষমা করতে পারে না, সে আচরণেও স্ত্রীকে ত্যাগ করার কথা ভাবে নি—এমন কি প্রস্তাবটা স্ত্রীর দিক থেকে, ওঠা সত্ত্বেও না।

এতটা ভালবাসাই বোধহয় অন্যায়।

স্ত্রীকে এত স্বাধীনতা যদি না দিত সে, গুহাবাসীদের মতো দৈহিক প্রথাতে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে দিত!

আজ এই দ্বিতীয়-স্বদেশবাসীহীন প্রবাসে বসে শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে মন বহু দূরে চলে যায়।

শরীর ভেঙে আসছে—এই সময় আকুলি-বিকুলি করছে মন কোনো একটি প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গের জন্যে—একটুখানি সহানুভূতি, একটুখানি সস্নেহ

আচরণের আকাঙ্ক্ষায়।

তাতেই আরও মনে পড়ছে সে কত কি ফেলে এসেছে পিছনে, ইচ্ছা ক'রে, দম্ভ আত্মঅহমিকা চরিতার্থ করতে।

বিচার করে নি, তাদের দিকগুলো ভাবে নি।

স্বচ্ছন্দে বাপের বাড়ির দিকটা আশ্রয় করতে পারত—সেও অহঙ্কারে বেধেছে বলেই তাদেরও কিছু না জানিয়ে এমনভাবে নিঃসঙ্গ দূর প্রবাসে চলে এসেছে—মায়াহীন মমতাহীন কতকগুলি মানব-নামধারী প্রবাসীর কাছে—যারা ওদের শুধু কালো মানুষ বলেই প্রচণ্ড ঘৃণা করে—যারা অশ্বেতাঙ্গ মাত্রকেই জানে নিগ্রো, কাফ্রী-ক্রীতদাস-বংশোদ্ভূত।

এই অত্যাধিক দম্ভের জন্যেই আরও একটি জীবন নষ্ট ক'রে দিয়েছে সে।

এবং তার পরেও তার কথা ভাবে নি, অনুতপ্ত হয় নি।

সে বহুকালের কথা।

এখন যেন মনে হয় কত শতাব্দী আগের।

এ ঘটনা তার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে বলেই সে জানত—অন্তত বহুদিনের মধ্যে বোধহয় একবারও মনে পড়ে নি।

আজ এই সুদূর নিঃসঙ্গ প্রবাসে বসে যখন অতীত স্মৃতি রোমন্থন করা ছাড়া মনের কোনো আশ্রয় বা অবলম্বন নেই—তখন সেই প্রথম বয়সের নিষ্ঠুরতার কথাও মনে পড়বে বৈকি!

অর্থাৎ এই তার স্বভাব, চিরদিনের।

এইভাবেই সে গড়ে উঠেছে।

তখন প্রথম বয়সের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য, আত্মীয়-স্বজনের অতিরিক্ত প্রশ্রয়, পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সমস্ত পুরুষের চোখে মুগ্ধ বিহ্বলতা—ওকে নিজের অবিচার বা অপরাধের দিকে চাইতে দেয় নি, অনুতপ্ত হতে দেয় নি।

যেন সকলের মাথার ওপর পা দিয়ে চলার ওর জন্মগত অধিকার—এই ধারণাকেই লালন করিয়েছে।

সকল বাড়াবাড়িরই একটা প্রতিক্রিয়া—না, প্রতিফল আছে।

বিশেষ অহঙ্কার চরিতার্থ করার জন্যে মানুষ যখন বাড়াবাড়ি করে, মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—সে আচরণ ব্যুমেরাঙ্ হয়ে দশগুণ আঘাত ফিরিয়ে দেয় সে নির্বোধ অহঙ্কারীকে।

সুমনের কথাই আজ বেশি মনে হচ্ছে।

মুকুটের কাছেও ওর অপরাধের অন্ত নেই, তবু সেখানে কিছু কৈফিয়তের অবকাশ আছে—সুমনের বেলা বুঝি সেটুকুও নেই।

সুমন ওদের প্রতিবেশীর ছেলে। ঠিক পাশাপাশি নয়, একখানা বাড়ির পরে ছিল ওদের বাড়ি।

ওর বাবার সঙ্গে এই সুমনের বাবার প্রতিবেশী হিসেবেই পরিচয়, তা হলেও ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

ছুই পরিবারের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল আত্মীয়াধিক আত্মীয়ের।

সুমনের বাবা নাম রেখেছিলেন দেবদেব, রুমার বাবা বললেন, 'না, নাম থাক সুমন, ওর সু অর্থাৎ উত্তম মন হোক।'

সুমনের বাবা নির্বিচারে সে নামকরণ মেনে নিয়েছিলেন।

তিনি অবশ্য দেবু বলে ডাকতেন, কিন্তু স্কুল-কলেজে ঐ সুমন নামই পাকা হয়ে গিয়েছিল।

সুমনের সঙ্গে রুমার বয়সের পার্থক্য ছিল মাত্র বছর চারেকের।

সুমন যে বছর বি-এ পাস করে, রুমা সেই বছরই স্কুলের পড়া শেষ করে।

সুমন বা দেবু, রুমার মা আদর ক'রে বাবু বলতেন, কখনও বাবনটু—সোজাসুজি এম-এ পড়তে গেল।

ইতিহাসে এম-এ।

তার শখ ছিল এর পরে ফিলজফিতে এম-এ দেবে—তারপর অধ্যাপনা করবে।

করতে করতে যদি সম্ভব হয় ছুটোতেই, না হয় একটাতে ডক্টরেট পাবার চেষ্টা করবে।

রুমার এটা পছন্দ হয় নি।

এই মানসিক দৈন্য।

উচ্চাশার অভাব।

অন্তত সে তাই ভেবেছিল।

সে বলেছিল, 'এ যুগে মাস্টারী! ছোঃ। লোকে বলবে বাবন্তু নয় হনুমন্তু।'

'তা তুমি কি করতে বলো?' দেবু জিজ্ঞাসা করেছিল।

'যখন সায়ান্স পড়ো নি তখন আর কি বলব—অন্তত আই. এ. এসটা দাও।'

'ও আমার ভালো লাগে না রুমা, তা তো জানই। রাজনীতি, শাসন-ব্যবস্থা—এতে অনেক সময়ই মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিতে হয়। ভালো অধ্যাপক হতে পারলে বহু ছাত্রের কল্যাণ করতে পারব—তাদের শ্রদ্ধা ভালবাসার দামও কম নয়। পয়সা কিছু কম বেশীতে জীবনের এমন কিছু কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়? বরং দেখেছি যত পয়সা আসে ততই অশান্তি আর নিরানন্দ বাড়ে মানুষের জীবনে।'

সেদিন ওকে 'বোকা' 'সেকেলে' 'গ্রাম্য' 'টুলোবামুন' 'বুনো রামনাথের চেলা' বলে অভিহিত করেছিল রুমা।

কিন্তু আজ কি এ কথাগুলোর সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝছে না?

টাকা বেশী হলেই যে সেই সঙ্গে অশান্তি থাকে, আসে অ-সুখ—সে তো নিজেকে দিয়েই বুঝছে।

যে সমাজে গত ক'বছর বাস করেছে—সেখানেও এ দৃষ্টান্তর অভাব ছিল না।

দেখেছে, বুঝেছে। তবু তখনও সুমনের কথা মনে পড়ে নি।

তবু, এ মতভেদে কোনো সত্যকার অপ্রীতি হয় নি।

বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা—প্রেম হয়ত নয়—প্রীতির সম্পর্ক আরও বেড়েছে, দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই পরস্পরের মনের নিকটে এসেছে। হয়ত এই স্নিগ্ধ সাহচর্যটুকুর প্রভাবেই -সত্যিই দেবুর এমন একটা মাধুর্য ছিল যে তার সাহচর্যে খুব ক্ষুব্ধ বা উত্তপ্ত মনও শান্ত প্রসন্ন

হয়ে উঠত—প্রথম কলেজ-জীবনে রুমা সহপাঠীদের বহু আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছে।

সুন্দর সুপুরুষ, বলিষ্ঠ পৌরুষযুক্ত তরুণও যে তাদের মধ্যে কেউ ছিল না তা নয়—তবু দেবুকে দেখে ওর সঙ্গে মিশে আদর্শ সঙ্গীর যে একটা মানদণ্ডের ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে কাউকেই মানুষ বলে মনে হয় নি।

আর মানুষ ছাড়া কার সঙ্গে প্রেম করবে সে!

কী আকর্ষণে?

সম্পর্কটা আগাগোড়া সখ্যরই ছিল।

দেহজ আকর্ষণ কিছু অনুভব করলেও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না ওরা কেউই। তবু কেন কে জানে রুমার মনে হত দেবু—ও বাবু নামটাই বেশী পছন্দ করত—বাবুর ওপর সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব ফলাবার ওর একটা সহজ অধিকার আছে—আর বাবুও সে ধারণা নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি।

তখন দুজনেই পড়াশুনোয় ব্যস্ত। কদাচ কোনো ছুটির দিনে দুজনের একসময় অবসর থাকলে—ওরা কোনো অপরিকল্পিত ভ্রমণেই বেরিয়ে পড়ত।

এটা যেন নিয়মের মতো হয়ে গিছল।

এতে দু পক্ষের কোনো অভিভাবকই আপত্তির কারণ দেখেন নি।

এই ছেলে আর এই মেয়েটির মনের জোরের ওপর তাঁদের বিশ্বাস ছিল অপরিসীম।

আর, অপরিকল্পিত থাকলেও গন্তব্যস্থান এদের অজ্ঞাত থাকত না—যাবার আগে বলে যেত—বোটানিক্যাল গার্ডেন বা ডায়মণ্ডহারবার বা তমলুক। যেদিন যে ইচ্ছা জাগত—সেই মুহূর্তে।

খাবারের প্যাকেট ও জলের বোতল তৈরি থাকত—ইচ্ছা তৈরি হবার আগেই।

সেই একবারই এর ব্যতিক্রম হয়েছিল।

সেটা ছিল একটা কি মুসলমান পর্বের দিন। রুমাই আগের দিন গিয়ে ওকে বললো, 'চলো কাল বাঁশড়ায় যাই।'

'সেটা আবার কি ?'

'এত লেখাপড়া শিখে ব্যাকরণে ভুল ! কি না, কোথায় বলো।'

'আচ্ছা, ভুল মেনে নিচ্ছি, এখন দয়া ক'রে একটু পরিষ্কার করো কথাটা।'

'ঘুঁটিয়ারী শরিফ—লোকাল নাম বাঁশড়া। ক্যানিং লাইনে সোনারপুর মনে আছে, যেখানে নেমে আমরা হরিনাভি গিছলুম। সোনারপুরের পরে দুটো কি তিনটে ইষ্টিশান পরেই। খুব কাছে।'

'সেখানে দেখার কি আছে ?'

'সেখানে বিরাট মেলা হয়। খুব বড় এক পীর ছিলেন। তাঁর সমাধিতে লোকে পুজো দেয় সিন্নি চড়ায়—কত কি মানসিক করে। প্রতি শুক্রবার ভোরেই খুব ভিড় হয় আর এই সব পরবের দিনে মেলা বসে, অনেক মাটির জিনিস বিক্রি হয়। আমাদের সেকেলে ভারী ঢালাই ঘড়ার মতো মাটির ঘড়া পাওয়া যায়। চাই কি একটা কিনেও আনতে পারি—যদি কোনো দিন তোমার গলায় বেঁধে ডুবতে ইচ্ছে হয়—কাজে লাগবে।'

'তার জন্যে মানসিক ঘড়া তো ঢের আছে। তোমার মতো একটি দজ্জাল ঝগড়াটি মেয়ে গলায় বাঁধাই তো যথেষ্ট—সে ডোবার তুলনা নেই।'

'যে কলসী ভ'রে গেলে মানুষকে ডোবায়, সেই কলসী উপুড় ক'রে ভাসালে ডোবা থেকে বাঁচা যায়—তা বুঝি জানো না ! একই রুদ্রের দুই মুখ—পালন ও সংহার। রুদ্রের দক্ষিণ মুখও তো আছে।'

'ডাক্তারী পড়ছো পড়ো—দর্শনের লেকচারটা আমার জন্যে থাক।'

কৃত্রিম অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বলে দেবু।

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কথার সমাপ্তি ঘটলেও যাত্রাটা যে ধ্রুব সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় ছিল না দুজনের কারও মনে। রুমার ইচ্ছাই তো যথেষ্ট। সে ধারণা বাবুরও যেমন, রুমারও তেমনি—কতকটা সহজাত।

কিন্তু অপরিকল্পিত যাত্রায় কখনও বাধা না ঘটলেও পূর্বপরিকল্পিত যাত্রায় এই প্রথম বাধা পড়ল।

কথা ছিল দুপুরের কোনো ট্রেনে যাবে ওরা—কিন্তু সকালবেলাই দেবু শুকনোমুখে একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতো এসে জানাল, ওর ইস্কুলের পুরনো এক মাস্টারমশাই হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ইনি ওকে খুব স্নেহ করতেন—যত্ন ক'রে পড়িয়েছেন। বাড়িতে ডেকে পড়িয়েছেন কতদিন কিন্তু তার জন্যে কোনো পারিশ্রমিক নেন নি।

মানুষটি অকৃতদার। এক ছাত্রর বাড়ির একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকেন – নিজে রেঁধে খান। খান মানে আগে খেতেন, এখন একটি লোক রেখেছেন—সে-ই অন্য কাজকর্মও করে, রেঁধেও দেয়।

যে বাড়ি থাকেন—তারা সপরিবারে ওয়ালটেয়ার চলে গেছে, দেখার কেউ নেই, আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় থাকেন তারও খোঁজ নিয়ে তাদের জানানো দরকার।

বাবু এখনই সেখানে যাচ্ছে—আজ আর বোধহয় ওদের বেড়াতে যাওয়া হবে না।

এ কারণ যথেষ্ট, বাবুর মতো হৃদয়বান ছেলের পক্ষে।

রুমারও তো বোঝা উচিত ছিল।

অন্যদিন হলে বুঝত ও—সেও খুব স্বার্থপর মানুষ নয়—কিন্তু কী যে হলো সেদিন রুমার—সে একবারে অবুঝ হয়ে উঠল।

ভ্রূকুটি করে কেমন একরকমের শাণিত কণ্ঠে বললো, 'তা এমন ছাত্র তো তাঁর আরও ঢের কাছে নিশ্চয়, উনি মাস্টারী করছেন তো কম দিন নয় —যা তোমার মুখে শুনছি—তা অন্য কেউ আজ দেখতে পারে না— তোমাকেই সব এনগেজমেন্ট ক্যানসেল ক'রে যেতে হবে। তোমার ইচ্ছে নেই, তাই বলো?'

তবু বাবু মিনতি করেই বলেছিল, যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, 'ছাখো, ওঁর কোন্ ছাত্র কোথায় থাকে, কে কে খবর পেয়েছে—তাদের কার কেমন দায়িত্বজ্ঞান কিছুই তো জানি না—সেই অনিশ্চিত, আমার পক্ষে সুবিধেজনক, সম্ভাবনার ওপর বরাত দিয়ে থাকতে পারব না। যদি দেখি তেমন কেউ এসে ভার নিয়েছে—অবশ্যই চলে আসব। নইলে দেরি

হবে, তেমন কেস হলে—হসপিটালে'রিমুভ করতে যদি হয়—সেও ছুটো-ছুটি করতে হয়ত সারাদিন কেটে যাবে। ছাখো—এটা একটা বড় দায়িত্ব, ঋণ শোধের ব্যাপার—এটাকে অন্য চোখে দেখো না, লক্ষ্মীটি।'

আরও অনেক যুক্তি দিয়েছিল।

অনেক উদাহরণ।

রুমারও তো শিক্ষকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কম নয়—তবে সে কেন এই কর্তব্য বা দায়িত্বটাকে লঘু ক'রে দেখছে—এ প্রশ্নও করেছিল।

রুমা একগুঁয়ে ঘোড়ার মতো তবু 'শির-তেড়া' ক'রেই ছিল।

সব ঘটনাটাকে সে অন্য চোখেই দেখেছিল। একান্ত অবুঝের মতো এটাকে তার ব্যক্তিগত অপমান, বাবুর তরফ থেকে তাকে অকারণ উপেক্ষা বলেই ধরে নিয়েছিল।

ওরই সম্পূর্ণ অকারণ এ উষ্মা—পরে সবটা তলিয়ে দেখে বুঝেছে।

ওদের ঠিক ভালবাসার সম্পর্ক তখনও গড়ে ওঠে নি, অন্তত রুমার তরফ থেকে তেমন কোনো বন্ধন বা আকর্ষণ ছিল না—নেহাতই বন্ধুর সম্পর্ক, পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো কতকটা।

সেজন্য অভিমানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই নিষ্করুণ দাবিও অস্বাভাবিক।

তা ছাড়াও এসব ভ্রমণ সম্বন্ধে ওদের একটা কোনো নেশা ছিল না। হঠাৎই যেমন স্থির হয়—স্থির হবার পরও হঠাৎই অস্থির হয়েছে বেশ কয়েকবার।

এবার কেন এমন কঠিন মনোভাব হলো ওর—কেন এটাকে উপেক্ষা বা অপমান বলে গ্রহণ করল, তা আজও জানে না রুমা।

একেই হয়ত নিয়তি বলে।

দেবুরই নিয়তি।…

হয়ত বা ওরও।

দেবু সেদিন আগে চলে আসতে পারে নি। সেদিন একেবারেই বাড়ি ফেরা হয় নি তার।

সেদিনও না, তার পরের দিনও না।

কারণ দেখা গেল দায়িত্বজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সকলের ধারণা সমান নয়।

কাছাকাছির মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কেউ আসে নি।

শিক্ষক বন্ধু দু তিনজন এসেছিলেন, তবে তাঁরাও প্রায় বৃদ্ধ সবাই। সহানুভূতি জানানো ও উপদেশ ছাড়া কিছু করে উঠতে পারেন নি।

তবে একটা কাজ করেছিলেন—নিকট আত্মীয় বলতে শিলিগুড়িতে এক ভাগ্নে থাকতেন তাঁর ঠিকানা দিতে পেরেছিলেন। তাঁকে ট্রাঙ্ক কল করতে তিনি অবশ্য খুব দ্রুতই এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে দেবারই ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতেও সময় লেগেছে। একেবারে ভর্তি ক'রে দিয়ে ছুটি পেয়েছে দেবু।

সেদিনই বিকেলে এসেছিলো সে রুমাদের বাড়ি।

রুমা তেতলায় তার নিজস্ব ঘরে আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে গিয়েছিল।

একটু রাগারাগি করবে, হয়ত একটু অভিমান।

কিছু কিছু অলীক অভিযোগও করা বিচিত্র নয়।

হয়ত বলবে, 'তবে বুঝি অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাবার সুযোগ জুটেছিল।'

এটা মনে হয়েছিল, তার কারণ রুমা না যাক বাবু ইতিমধ্যে নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রুমা সম্বন্ধে অন্য কোনো আকর্ষণ বোধ করেছে—প্রেমের পথে এগিয়ে গেছে।

এটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে, ওদের অভিভাবকদেরও কোনো আপত্তি থাকবে না এও ধরে নিতে অসুবিধা হয় নি।

তবে সে ভাব মনে এলেও খুব গোপনে ছিল, হয়ত বেশির ভাগ অবচেতনেই।

কোনো দ্রুততাও ছিল না।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে এসব প্রশ্ন উঠতে পারে না, আর সে তো এখন· অনেক দূর।

তবে সেদিনের এই অকারণ উষ্মাতেই দেবুর আশা বা আকাঙ্ক্ষা কোথায় যেন একটু প্রশ্রয় পেয়েছে।

নিজেকে বিকিয়ে না দিলে অপরের মন বিকিয়ে আছে এটা কি কেউ ভাবতে পারে?

হয়ত কোনো কিছু ভাবার বা স্থির করার আগেই মনটা এই আশার দিকে কখন এগিয়ে গেছে অত বুঝতেও পারে নি।

আশার সৃষ্টি হয়, সে আশা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে ওঠে—যে আশা করে তার নিজের গরজেই।

কারণ বা সম্ভাবনায় বিচার সে ক্ষেত্রে অবান্তর।

তাই যা ঘটে গেছে তা ঘটেছে কোনো চিন্তা, বিবেচনা বা প্রস্তুতি বাদেই।

সেটা রুমা আজ বুঝতে পারছে। সেদিন বোঝে নি।

বোঝে নি তার কারণ একেবারেই অর্থহীন কারণহীন উষ্মায় উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল।

দেবু প্রথম দিকে সহজভাবেই কথা কইতে গেছে।

রুমাকে কঠিন ও নিরুত্তর দেখে বিনয় ক'রেই যুক্তি দিতে গেছে নিজের কাজের সমর্থনে—ক্ষমাও চেয়েছে।

তাতে বরফ গলেছে, অর্থাৎ নীরবতা ভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু উষ্ণতা কমে নি।

অনেক কড়া কড়া কথা বলেছে, বলতে গেলে যা-তা বলেছে।

ওর সম্বন্ধে এমন সব অভিযোগ করেছে তা যে একেবারেই মিথ্যা তা রুমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না।

এতেও যেন কোথায় একটা প্রশ্রয় পেয়েছে দেবু।

এর সবটাই তো অভিমান। আর অনেকখানি দাবি না থাকলে অভিমানের জোর পায় না কেউ।

কথাগুলো বলতে বলতে রাগে হৃদয়াবেগে অপমানবোধে থরথর ক'রে

কাঁপছিল রুমা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল, মুখ, গলা, কপাল, ঠোঁট সর্বত্রই।

ক্ষণে ক্ষণে আগুনের আভার মতো লাল হয়ে উঠেছিল মুখ।

ওর এ মূর্তি আগে কখনও দেখে নি দেবু, এমন সুন্দরও মনে হয় নি এর আগে।

সবটা জড়িয়ে অপরূপ, অদৃষ্টপূর্ব। বিশেষ সেই সময়টায় পশ্চিম আকাশের একটা মেঘের লাল আলো এসে পড়েছিল রুমার মুখে। সে এক অপূর্ব রঙের জাদু—দেবু আর সামলাতে পারে নি নিজেকে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সহজাত ভদ্রতাবোধ, সম্মান, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সব ভেসে চলে গিয়েছিল।

না—আলিঙ্গন করে নি, জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে নি, এমন কি গায়েও হাত দেয় নি—শুধুই হেঁট হয়ে একটি চুমো খেয়েছিল ওর মুখে। সে চুম্বন ঠোঁট সরিয়ে ভেতরেও ঢোকে নি, একেবারেই সামান্য একটু স্পর্শ মাত্র। রুমার ঠোঁটের ওপরের ঘাম দুচার ফোঁটা এর ঠোঁটে লেগেছিল—অন্তরঙ্গ স্পর্শ বলতে এইটুকুই।

প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল রুমা, ঘটনাটা বুঝতেই কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল।

তারপর একেবারে যেন আগুনের মতোই জ্বলে উঠেছিল।

এটাকে ওর আরও অপমান বলে বোধ হয়েছিল এই জন্যে যে, ওর তিরস্কারকে সম্পূর্ণ লঘুভাবে নিয়েছে দেবু। কিছুমাত্র গুরুত্ব দেয় নি।

সে প্রথম জড়তা বা বিহ্বলতা কাটতেই ত্বরিদ্বেগে টেনে একটি চড় মেরেছে ওর গালে। তাতেও শান্ত হতে পারে নি, যথেষ্ট বলে মনে করে নি। পায়ে নয়, পাশেই ছাড়া ছিল বাড়িতে পরার চটি—সেটাও তুলে নিয়েছে হাতে।

'এতবড় আস্পদ্দা তোমার! এত সাহস তোমার এলো কোত্থেকে। এ অধিকারকে দিয়েছে তোমায়। লোফার, স্কাউণ্ড্রেল, ছোটলোক। তোমার ঐ গুডিগুডি ভাব, ভালো ছেলের ছদ্মবেশ—সবটা মুখোশ। পাড়ার ঐ রক-

বাজ ছেলেদের সঙ্গে তোমার কোনো তফাত নেই।…তাই বা বলি কি ক'রে—তফাত আছে। তারা বাপ-মায়ের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকে এভাবে অপমান করতে সাহস করে না।…যাও, বেরিয়ে যাও, আর কখনও এসো না। নইলে সত্যি সত্যিই জুতো খেতে হবে।'

বেরিয়ে গিয়েছিল দেবু।

মাথা হেঁট ক'রেই বেরিয়ে গিয়েছিল, চোরের মতো।

এবাড়ি থেকে চিরদিনের মতোই।

ওর জীবন থেকেও।…

যদি ওখানেই থামত রুমা।

কী যে হলো তার—সত্যিই যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল।

নইলে এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে এমন কাণ্ড করতে যাবে কেন।

অথবা—আজ রুমার সন্দেহ হয়, চিরকালই পাগল ছিল সে। যে পাগলামিতে অভিভাবকরা চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হন, মাদুলি কবচ পরান সে পাগলামিও বোধ করি এর চেয়ে ভালো। এ সর্বনাশা, আত্মনাশা পাগল।

সে নিচে গিয়ে শুধু নিজের মা-বাবাকে নয়—দেবুর মা-বাবাকেও বলে এলো দেবু লম্পট, ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক।

এর পর আর ঘরে ও পরে—পাড়ার লোক বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে মুখ দেখানো সম্ভব নয়।

দেবু সেই রাত্রেই এক বস্ত্রে, কোনো টাকা পয়সা বই কিছুই না নিয়ে বেরিয়ে গেল, আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না তার।

খোঁজখবরের কোনো ত্রুটি হয় নি।—

বাড়ির কর্তারাই যথেষ্ট করেছেন।

পুলিশে খবর দেওয়া, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, রেডিওতে বলানো—যা যা প্রয়োজন সব করা হয়েছে, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে তাদের জানানো, পুলিশের ভাষায় 'য়্যালার্ট' করা—কিছুই বাদ যায় নি।

তবু কোনো খবরই পাওয়া গেল না কোথাও থেকে, মনে হলো যেন কর্পূরের

মতো উবে গেল ছেলেটা।

রুমা লজ্জিত না হলেও ওর বাবা-মা হলেন।

নিজেদের এর জন্য দায়ী বোধ করতে লাগলেন।

একমাত্র ছেলে ওঁদের— ছেলের মতো ছেলে। বেঁচে থাকলে নাম করার মতো মানুষ হত, বংশের মুখ উজ্জ্বল করত, ওঁদের ভাষায় 'লক্ষপুষী' হত। উদার চরিত্রবান কর্তব্যপরায়ণ ছেলে, বিদ্বান বুদ্ধিমান।

তাকে হারিয়ে তাঁদের আর কে রইল, কী রইল।

সকলেই ধরে নিলেন সে আত্মহত্যা করেছে।

এক বস্ত্রে, এক কপর্দকও না নিয়ে লোকালয়ে কোথাও গা-ঢাকা দেওয়া যায় না।

জীবন ধারণ করতে গেলে অন্ন চাই। মনুষ্যসমাজে বাস করতে গেলে বস্ত্র চাই।

আর তা হলে অর্থও প্রয়োজন।

সে অর্থ উপার্জন করতে গেলে—মোট বইতে গেলেও লোকালয়ে লোক-চক্ষুর গোচরে থাকতে হবে।

তবু ওর বাবা কাজে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থে তীর্থে শহরে শহরে ঘুরবেন, যদি কোথাও কোনোদিন তার দেখা পান।

এককথায় সংসারটাই ভেঙে গেল তাঁদের।

রুমার বাবা যত না হোক, মা কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন।

বললেন, 'তুমি এমন কি স্বর্গের অপ্সরী কি সরস্বতী এসেছ যে ও তোমার কাছে এত হেনস্থার পাত্র হয়ে গেল। আর আজকাল তো কত কি করছে মেয়েরা বিয়ের আগে, একটা চুমো খেলে একেবারে তোমার এতো মর্যাদা-হানি হয়ে গেল! তোমার বন্ধুরা কি না ক'রে বেড়ায়, তুমিই তো গল্প করেছ। তুমি কি করেছ না করেছ তাই বা কি করে জানছি! তাও, তাকে তো যথেষ্ট শাস্তি তুমিই দিয়েছ—আবার এত ঢাক বাজিয়ে তুমি কত ভালো মেয়ে বিজ্ঞাপন ক'রে বেড়াবার কি ছিল এত! নচ্ছার পাজী মেয়ে কোথাকার। অত বড় একটা জীবন নষ্ট ক'রে দিলে। ছেলেটাকে এত বড়

আঘাত দিয়ে— হয়ত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে—তুই কি সুখী হতে পারবি জীবনে !

না,—সে সুখী হতে পারে নি।

মার অভিশাপ সে বলবে না,—সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

ফলেছে দেবুর মার অভিশাপ।

মন দিয়ে ডাক্তারী পড়ে ভালোভাবে পাস করেছে—ওর সাফল্যের গর্বে বাবা-মাও তুচ্ছ দেবুর কথা ক্রমে ভুলে গেছেন।

ভুলেছে রুমাও, তাই সে নিশ্চিন্ত মনে সুখী জীবনের দিকে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

মুকুট রূপের দিক থেকে দেবুর চেয়ে অনেক ভালো—দেবু গুণে কি হত তা সে জানে না।—মুকুট প্রতিষ্ঠিত, ধনী, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান।

শুধু বোধহয় সেই অভিশাপটাতেই এমন স্বামী পেয়েও সে বঞ্চিত হলো।

দেবু কোথায় গেল কে জানে।

সে কি বেঁচে আছে ? যদি বেঁচে থাকে—ওকে কি ক্ষমা করতে পেরেছে ?

প্রথম প্রথম, যত তিরস্কৃত হয়েছে, যত নিজের বিবেকের কাছে তর্জিত হয়েছে—ততই উদ্ধতভাবে নিজেকে সমর্থন করেছে, যুক্তি প্রতিযুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষ ও বিবেককে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে সে কিছুমাত্র অন্যায় করে নি, যা করেছে, যে কোনো সৎ মেয়ে হলে তাই করত।

কিন্তু নিজে কি বিশ্বাস করতে পেরেছে সেটা ?

কালক্রমে ভুলে গিয়েছিল সে।

অল্প বয়সের এই ভুল বেশী বয়সে মনে থাকা সম্ভব নয়--তবু তার বিবেক কি আজও তেমনি ভ্রূকুটি ক'রে নেই ?

'আজও' বলা হয়ত ভুল।

ক্রমেই সে ভ্রূকুটি কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে।

যত ভাবছে, যত বিচার করছে ততই নিজেকে ঘৃণ্য অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

মার্জনার অতীত অপরাধী।

তবু মার্জনাই চায় সে।

'বাবু, বাবু—যদি বেঁচে থাকো—আমায় ক্ষমা করো। তোমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবার ঋণ নিজের জীবন ব্যর্থ ক'রে শোধ করেছি—আর কোনো গ্লানি রেখো না মনে।'

পাগলের মতো আপনমনেই বলে বারবার।

৮

তবু যেটুকু সূক্ষ্ম আশা ছিল মনে—একটা অবলম্বন ধরে থাকার, সেটাও রইল না।

স্কেটিং করতে গিয়ে কিংবা অন্য কোনো প্রমোদভ্রমণে নয়, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে খাবার ঘরে যাবার সময়ে কার্পেটে পা পিছলে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে পড়ল।

কাঠের সিঁড়ি, কার্পেট দেওয়া তবু পেটে আঘাতটা জোরই লেগেছিল। প্রথমটা কেউ অত লক্ষ্য করে নি, করল যখন—অজস্র রক্তক্ষরণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে।

পরে অবশ্য হোটেলের কর্তৃপক্ষ যা করবার সবই করলেন, মালেকা এক বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা, তিনি এই বিদেশী মেয়েটিকে স্নেহের চোখেই দেখে-ছিলেন।

ও যে দুঃখিনী, একটা প্রচণ্ড বেদনা বহন করছে মনে মনে, তা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় নি।

তিনি বিশেষ ক'রে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু ছেলেটা বাঁচল না।

ছেলেই হয়েছিল—সুন্দর ছেলে হত বেঁচে থাকলে—নার্সের মুখে শুনে-ছিল।

এরপর সেরে উঠতে যা মাসখানেক সময় লেগেছিল, একটা আচ্ছন্নভাবে কেটেছে রুমার। হয়ত এঁরা কিছু কিছু তেমন ওষুধও দিয়েছিলেন— কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠে ওর আর এখানে থাকতে ইচ্ছে হলো না।

এ নির্জনতা যেন গলা টিপে ধরছে তার।

বোধহয় আগেই ধরেছিল। নির্জনতাই বিমর্ষতার সৃষ্টি করে, দুঃখদায়ক

চিন্তা ও স্মৃতিকে বেশী ক'রে তুলে ধরে মনের সামনে।
যারা মনে করে দুঃখের দিনে নির্জনে থাকলে শান্তি পাবে, মন শান্ত হবে —তাদের থেকে নির্বোধ আর কেউ নেই।
দুঃখ দুশ্চিন্তা ভুলতে গেলে বহু লোকের মধ্যেই থাকা দরকার।
প্রথমটা মনে মনে বিরক্তি কি অস্বস্তির ভাব জাগে হয়ত কিন্তু সেটাও মিথ্যা।
কল্পনা মাত্র।

সে লেখালেখি ক'রে লণ্ডনে চলে এলো।
এখানে তার পরিচিত বহুলোক আছে।
দু-একজন বান্ধবী সহপাঠিনীও।
আত্মীয়ও আছে একজন, পিসতুতো ভাই। তিনি অধ্যাপনা করেন, তাঁর স্ত্রীও ডাক্তার।
কুড়ি বছর দেখাশুনো নেই—তবু চিঠি পাওয়ামাত্র তাঁরা সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।
আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন না।
ওখানে গিয়ে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নিতে অসুবিধে হলো না।
সেই সঙ্গে একটা ঘরও পাওয়া গেল— কর্মস্থলের এগারো মাইলের মধ্যে।
এইটেই বড় লাভ যুদ্ধোত্তরকালে।
মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল রুমা।
আর সে কিছু ভাববে না, পিছন দিকে চাইবে না।
মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ আবৃত্তি করে—

“তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাস নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে॥”

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যতই করুক, "অতীতের পাপ পরবর্তী জীবনে বারবার দেখা করতে আসে"—ইংরেজী প্রবাদ আছে একটা—ওর সেই 'পিছনের দিক' কখন একসময় নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ায় তা বুঝতে পারে না।

নিজের জীবনের স্বয়ং সৃষ্ট ব্যর্থতা, বর্তমান জীবনের শূন্যতা—মুকুট, দেবু, এমনকি তার সেই না দেখা, 'অজাত' বলাই উচিত, শিশু সন্তান—কাজের মধ্যে, বিশ্রামের অবসরে নিরন্তর যেন তাকে পীড়ন করে।

অবশেষে, বুঝল এ শূন্যতা তার জীবনে নয়—মনেই।

তাকে পিছনে ঠেলে রাখবে কেমন ক'রে।

অবশেষে এ অবস্থায় অন্য কোনো কোনো লোক যা করে সেও তাই করল—স্মৃতি ভোলার জন্য অধঃপাতের পথ ধরল।

এ পথে সঙ্গীর অভাব হয় না—ওরও হলো না।

এরপর বছরখানেক কাটল ওর যেন একটা দুঃস্বপ্নের-মধ্যে দিয়ে।

দুঃস্বপ্ন বলাও ভুল।

মানুষ সুখশয্যায় শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে, তাতে তার দেহের, জীবনের কোনো ক্ষতি হয় না।

একে নরকোৎসব বলাই উচিত।

দুঃস্বপ্ন ভোলারই আয়োজন এটা।

মদ এবং ব্যভিচার—পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে—শয্যাসঙ্গী।

আরও, আরও নামবে সে।

নিজের জীবন ব্যর্থ হয়েছে, আরও দুটি মূল্যবান জীবন নষ্ট করেছে, কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষের জীবনে এনে দিয়েছে জীবনমধ্যাহ্নে রাত্রির অন্ধকার।

তার আর বাঁচবার, ভদ্রসমাজে মাথা তুলে থাকার কোনো অধিকার নেই।

নিজের পাপের শাস্তির ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

সেই ভবঘুরে ইহুদী আর অশ্বত্থামার মতো মানবসমাজে ঘৃণিত উপস্থিত হয়েও মানবসমাজেই বাস করতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে।

আত্মহত্যা?

না, তা সে করবে না!

আত্মহত্যা করলে বহুলোক বিব্রত হবে, সে ভারতীয়—ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনে খবর যাবে, দিল্লীতে—যদি মুকুট বেঁচে থাকে শুনে ব্যথা পাবে, লজ্জা পাবে।

না, তার দরকার নেই। তার চেয়ে এই তো ভালো, এও তো আত্মহত্যারই পথ।

কিন্তু বছর খানেক পরে টাকাও ফুরোল, স্বাস্থ্যও।

অতিরিক্ত মদ—তার ওপরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে যেন জন্তুর মতো হয়ে গেল।

সবচেয়ে যেটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠল—সঙ্গীর অভাব।

আর কোনো পুরুষ প্রলুব্ধ হয় না, অতিমাত্রার লম্পট পুরুষও না।

মদ খাওয়াবার টাকা দেবার লোভ দেখিয়ে দিনকতক নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ ডেকে আনতে পেরেছিল, তারাও আর আসতে চায় না।

যে বিছানায় শুয়েই বেহুঁশ হয়ে পড়ে, ভুল বকে, তাকে নিয়ে কি করবে ওরা ?

যদি বা কেউ আসে ওর ঐ অবস্থার সুযোগ নিয়ে চুরি ক'রে পালায়।

ওর এক এক সময় মনে হয় সেই স্কুটারওলাটার কথা। যদি তাকে নিয়েই কোথাও চলে যেত, সে ওকে ছাড়ত না।

লোকে কথায় বলে এক কড়া দুধে এক ফোঁটা চোনা—অতি সামান্য খারাপ জিনিসের সংস্পর্শে এলে অনেকখানি ভালো জিনিস নষ্ট হয়ে যায়।

মদ জুয়া প্রভৃতি সৎ মানুষের জীবনে তেমনি অসৎ বীজাণু।

এর উল্টোটাও আছে। কোনো যথার্থ সৎ বুদ্ধি সৎ গুণ যদি থাকে, মানুষ অনেক অসৎ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে।

যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাস, সত্যকার প্রেম তেমনি জিনিস।

বটের অতি ক্ষুদ্র বীজ বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়—ঝড় ঝঞ্ঝা অননুকূল পরিবেশ তাকে নষ্ট করতে পারে না।

ইংরেজ লেখিকা মেরী করেলী বহুদিন পূর্বে ঈশ্বর বিশ্বাসকে পরমাণুর সঙ্গে

তুলনা করেছিলেন—তিনি বিখ্যাত একটি উপন্যাস লিখেছিলেন 'মাইটি অ্যাটম' নাম দিয়ে —ঈশ্বর-বিশ্বাসের এই শক্তি নিয়ে। এর সত্যতা রুমা নিজের জীবনেই অনুভব করল—বুঝতে পারল কথাটার অর্থ।

অকস্মাৎ নিজের উপর প্রবল ঘৃণায় একদিন যেন একটানা একটা আচ্ছন্নতা অচৈতন্যতা থেকে জেগে উঠল। আকণ্ঠ ঘৃণা, অপরিমাণ বিতৃষ্ণা—এই দেহটা, এই জীবনটা সম্বন্ধে।

এ কী জীবন ও যাপন করছে! জন্তুরাও বুঝি এর থেকে ভদ্র জীবন যাপন করে।

তারা অন্তত ইচ্ছে ক'রে নিজেকে নষ্ট করে না। ইচ্ছে ক'রে নরকের স্বাদ পেতে চায় না—স্বর্গের স্বাদ পাবার অজস্র উপায় আর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও।

না, আর নয়। নরকের তল পর্যন্ত দেখা হয়ে গেছে, এবার মৃত্যুটা দেখা দরকার।

তারপরেও আর কি আছে, তখনও কি এ দুর্ভাগ্য তাকে ছাড়বে না—এই দুষ্কর্মের ফল?

অর্থাৎ আত্মহত্যা। উপায় তো অতি সহজ—কয়েকটা ঘুমের বড়ি খাওয়ার ওয়াস্তা।

তাই করবে সে।

মৃত্যু কখন আসবে জানতেও পারবে না।

তারপর দেহটা?

এই ঘৃণিত পচা দেহটা নিয়ে যে যা খুশি তাই করুক। কুকুরে খেলেও আপত্তি নেই ওর।

কিন্তু ঘুমের বড়ি পাশে রেখে শুয়ে হঠাৎ আর একটা বড় সত্য আবিষ্কার করল।

মুকুটকে সে আজও ভুলতে পারে নি।

অন্তত আর একবার দেখতে চায় ও তাকে।

শেষবারের জন্যেও।

না, কাছে গিয়ে আর তার যন্ত্রণা বাড়াবে না, দূর থেকে দেখে একটি নমস্কার করে সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করবে।

সেদিন মরা হলো না। তার পরদিনও না।

তারও পরের দিন কেটে গেল।

এই তিনদিন ধরে ক্রমাগত সে মুকুটের কথাই ভেবেছে।

আর সেই সঙ্গে একটি মহান সত্য, আশ্চর্য অবিশ্বাস্য সত্য আবিষ্কার করেছে—মুকুটকে সে আজও ভালবাসে।

জীবনে একমাত্র তাকেই ভালবেসেছিল, আর কাউকে নয়।

তার এই অন্ধকার, অপরাধে অহঙ্কারে ব্যর্থতায় ভরা জীবনে ঐ একটিমাত্র ধ্রুবতারা—মুকুট।

না, তাকে না দেখে সে মরতে পারবে না, কিছুতেই না।

যদি মুকুট আর কাউকে জীবনসঙ্গিনী ক'রে থাকে?

ভালোই তো। সত্যিই ও সুখী নিশ্চিন্ত হবে তাতে। ও তো আর তার জীবনে ফিরে যেতে চাইছে না। অন্য বিয়ে না করলেও ও যাবে না—বেচারীর জীবন বিড়ম্বিত করতে।

সে স্পর্ধা, সে ধৃষ্টতা তার নেই।

সে দেবতা—এই পচা দেহটা তার পায়ে নিবেদন করতে যাওয়ার মতো উন্মাদ সে আজও হয় নি।···

সমস্ত অবসাদ, বিষাদ এবং জড়তা ত্যাগ ক'রে সে, মনে মনে অন্তত, আবার সোজা হয়ে বসল।

সে ভারতবর্ষেই ফিরে যাবে এবার।

এ দেহ যদি রাখতে হয়—যেখান থেকে পেয়েছে সেই ভারতের মাটিতেই রাখবে।

তবে তার আগে ঐ একটা কাজ বাকী—

দেব দর্শন।

তার কাছে ঈশ্বর দর্শন।

৯

দেশে ফিরে দিল্লীতেই এলো সে আগে।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

আপিসে কিছু পাওনা আছে। হয়ত গেলে পাওয়া যেতে পারে।

সেই সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে মুকুটের খবরও।

দিল্লীতে পৌঁছে সে একটা হোটেলেই উঠেছিল।

তাও, একা স্ত্রীলোককে ঘর দিতে চায় না তারা।

পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখিয়ে সমূল্য আশ্রয়ও আদায় করতে হয়েছে।

থিতিয়ে বসেই একটা ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়েছিল ওদের পুরনো পাড়ায়। যেতে যেতেই দেখল, লেটার বক্সের কাঁচের ওপর মুকুট ও রুমার নামের বদলে কোনো এক মিস্টার য়্যাব্রল, আর জনৈক আগরওয়ালের নাম।

অর্থাৎ ফ্ল্যাটটা দুজনে মিলে ভাড়া নিয়েছেন।

সেখান থেকে গিছল ব্যাঙ্কে।

টাকাকড়ির অবস্থা কাহিল। এখনই কিছু টাকা তোলা প্রয়োজন।

কিন্তু ব্যাঙ্কে ওর জন্যে একটি প্রচণ্ড চমক অপেক্ষা করছিল।

অনেক টাকা ওর জন্য জমা আছে। রুমার মাইনের সব টাকাই মুকুট জমা দিত—কিন্তু তেমনি য়ুরোপ যাবার আগে তার অনেকখানি তুলে নিয়ে গেছে রুমা, হাজার আড়াই পড়ে ছিল হয়ত—এই দু আড়াই বছর সুদে যেটুকু বেড়েছে তিন হাজারের বেশী হবে না, এই রকম একটা ধারণা ছিল। গিয়ে আবিষ্কার করল বিশ হাজার টাকার বেশী জমা আছে ওর নামে।

বিশ্বাস করার কথা নয়।

সহজে বিশ্বাস হ'লও না।

বার বার সে জিজ্ঞাসা করল, ওদের কোনো ভুল হচ্ছে না তো।
তারা শেষ পর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে বিশ্বাস করতেই হলো।
কুলত্যাগিনী দেশত্যাগিনী স্বামীত্যাগিনী স্ত্রী যদি কোনোদিন ফিরে আসে—তার টাকার দরকার হতে পারে ভেবে যে এত টাকা জমা দিয়ে রেখেছে, তার কথা ভেবে—ম্যানেজারের সামনেই ওর দুচোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় জল ঝরে পড়ল।
প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্নিবার আবেগ রোধ করতে পারল না।
কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরও ছিল কিছু বিস্ময় আনন্দ—ও সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আত্মধিক্কারের খোরাক।
ওদের দুজনের যুক্ত নামে লকার।
চাবি অবশ্য মুকুটের কাছেই থাকত।
মানেজার ওর এই আকস্মিক ও অকারণ চোখের জলের লজ্জা সামলে নেবার অবসর দিতেই উঠে গিয়ে কী সব সিন্দুক-টিন্দুক খুলে চাবিটা বার ক'রে এনে সামনে দিয়ে বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, এ চাবিটাও আমাদের জিম্মায় রেখে গেছেন, আপনি এই ফর্মটায় সই ক'রে দিয়ে চাবিটা নিয়ে যান, লকারের ভাড়া অবশ্য আমরা আপনার য়্যাকাউন্ট থেকেই কেটেছি।'
হায় মথুরাবাসী ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। তুমি এক লজ্জা ও বেদনা ঢাকতে অনেক বেশী লজ্জা ও বেদনার কারণ সামনে এনে হাজির করলে।
মথুরাবাসীরা বৃন্দাবনের গোপিনীদের দুঃখ কোনোদিনই বোঝে নি, তুমি সেই ঐতিহ্যই বুঝি আজও বহন করছ।
অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল রুমা।
হঠাৎ মনে হলো যদি লকারে কোনো চিঠি লিখে রেখে গিয়ে থাকে।
আশা ও আশ্বাসের বার্তা কিছু।
কিংবা নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো সঙ্কল্পের কথা।
'আমি—আমি লকারটা একবার খুলতে চাই মিঃ চোবে। সম্ভব হবে?'
'নিশ্চয়ই। এক মিনিট।'
যথারীতি লেজার বার ক'রে ওর নাম লিখে খাতাটা এগিয়ে দিলেন, সই

হতে চাবির গোছা নিয়ে ভল্টে গেলেন আগে আগে। তারপর রুমার প্রায়-অবশ কাঁপা কাঁপা হাত চাবিটা পরাতে পারছে না দেখে নিজেই ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে লকার খুলে দিয়ে চলে গেলেন।

না, কোনো চিঠিপত্রর চিহ্নমাত্র নেই।

আছে যা তা বিচিত্র জিনিস।

একে কি বলবে সে!

ধিক্কার?

তিরস্কার?

না কি সীমাহীন প্রেমেরই অভিব্যক্তি?

ওর প্রথমটায় মনে হয়েছিল এর থেকে কঠোর তিরস্কার বা ধিক্কার কিছু হ'তে পারে না।

কিন্তু সে কয়েক লহমা মাত্র। তার পরই মনে পড়ল—মুকুটকে।

ওকে তিরস্কার করবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

কঠোর কোনো ধিক্কার তো নয়ই।

তা পারলে আজ রুমার এ দুর্গতি হবে কেন!

কি আছে?

ওর সম্বন্ধে সুগভীর প্রেমের নিদর্শন। প্রেম আর শুভ চিন্তার। স্ত্রীর ভবিষ্যতের চিন্তার।

ওর ফেলে যাওয়া গহনা সমস্তগুলি। বাক্সয় রাখলে স্থানাভাব ঘটবে বলে একটা পলিথিনের খামে জড়িয়ে রাখা—ছোটখাট, এক কুঁচি সোনাও বাদ নেই।

ওর যে এত গহনা আছে—ছিল—রুমা কোনোদিন ধারণাও করতে পারে নি!

আর আছে, মুকুটের কলকাতার বাড়ির দলিল, কাগজপত্র।

সেই সঙ্গে একটি রেজেষ্ট্রীকৃত উইল—মুকুট তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী রুমাকে দিয়েছে, তবে সেই সঙ্গে এও লেখা আছে—যদি মুকুটের মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যেও রুমার কোনো খবর বা ঠিকানা না

পাওয়া যায়—সব কিছু রামকৃষ্ণ মিশনে যাবে।...
ঝাপসা নয় ততক্ষণে দুই চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে।
কোনোমতে লকারে চাবি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে এলো ব্যাঙ্ক থেকে —তারপর হাউজখাসের পথে একটা নির্জন কোনো শাহী মকবরার কাছে এসে ট্যাক্সী ছেড়ে দিয়ে সেই পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় সমাধি মন্দিরের সামনে ঘাসের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।
কেঁদে বাঁচল।

অনেক দ্বিধা অনেক কুণ্ঠার পর—শেষ পর্যন্ত মুকুটের আপিসে একটা ফোন

বললো, সে মুকুটের এক বান্ধবী, বহুদিন পরে বিলেত থেকে এসেছে—ওর ঠিকানা জানতে চায়।
আপিসের এক কর্তাব্যক্তি নির্ঘাত সংবাদটা জানালেন, রুমার এদেশ ছাড়ার পরেই—মানে সেই তারিখে হিসেব ক'রে ব্যাপারটা বুঝল রুমা—সে চাকরি ছেড়ে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে কোথায় চলে গেছে।
এখানের বাংলোও ছেড়ে দিতে হয়েছে, কারণ সেটা এই আপিসের—সুতরাং এখন কোথায় আছে, কি করছে তা ওঁরা জানেন না।
এটা জানত রুমা, এই রকমটাই অনুমান করেছিল—তবুও কোথায় একটা ক্ষীণ আশা বুঝি মনের এক প্রত্যন্ত কোণে থেকে গিয়েছিল—সেটার অস্তিত্ব সে টের পেল এই আশাভঙ্গে।
মনটা একেবারেই ভেঙে পড়ল এবার—এইবার মনে হলো তার সত্যিই কোথাও কেউ নেই—অবলম্বন বলতে আশ্রয় বলতে আর কিছু বা কেউ রইল না।
তবে কি সে আশা করেছিল যে থাকবে?
তার এতখানি দুর্ব্যবহারের পরেও অবিশ্বাসিনী, সতীত্বহীনা ভ্রষ্টা মদ্যপ স্ত্রীর জন্যেই বসে অপেক্ষা, তপস্যা করবে বসে—সেই স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের?
না, না, তা কেন হবে?

নিজের মনেই এ উত্তর জেগে ওঠে।

ছিঃ ছিঃ!

কোনো পুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

তবে?

এই তবে যে কি তা সে জানে না। কেউই বুঝি জানতে বা বুঝতে পারে না এমন অবস্থায়।

মানুষের মনের পুরো খবর মানুষ নিজেই রাখে না।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকরাই কি সম্পূর্ণ তল পান এদের মনের।

কেন এ আশাভঙ্গ, কেন এ হতাশা, বা এমন অসহায়-বোধ তা তলিয়ে বিশ্লেষণ করার শক্তি রুমার ছিল না।

থাকা সম্ভব নয়।

হয়ত এখনও, এত কাণ্ডর পরও সে যে আবিষ্কার করেছে যে মুকুটকে সে আজও ভালবাসে—সেই জোরেই একটা অসম্ভব অবাস্তব আশা সে বহন করছিল মনে।

কে জানে!

এতটা ভালবাসার খবর সেও তো বোঝে নি এত দিন।

আরও একটি মানসিক আঘাত—না আঘাত ঠিক নয়—ধাক্কা—তার জন্য অপেক্ষা করছিল আপিসে।

এই আড়াই তিন বছরে অনেকে বদলি হয়েছেন।

যেসব পুরাতন সহকর্মী বা উর্ধ্বতন অফিসার এখনও আছেন—তারা বদলে গেছেন। মানে ওর সম্বন্ধে মনোভাবে বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে তাঁদের।

অনেকেই চিনতে পারেন নি।

চিনতে পারা সম্ভবও নয়।

তা রুমাও জানত কিন্তু বিশ্বাস করে নি।

কেউই বুঝি এতটা বিশ্বাস করতে পারে না।

প্রথম চিনতে পারেন নি প্রায় কেউই, দু-একজন অল্পক্ষণেই পেরেছেন, বেশির ভাগেরই চার পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে মনে করতে।

যে সুশ্রী, 'গ্ল্যামারাস' তরুণীটিকে তাঁরা চিনতেন, যার ক্ষণিক সাহচর্য লাভের জন্য তাঁরা বিস্তর সরকারী টাকা খরচ ক'রে সেমিনার বা কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করতেন—সে কোথায় গেল।

এ কে ?

তাঁরা দেখছেন এক বিগতশ্রী, অতিরিক্ত মদ্যপানে কদাকার চেহারা, চোখের কোলে পর্যন্ত মদ্যপান ও অমিতাচারের চিহ্ন, শ্যামবর্ণা—এক মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক।

এই—অবাঞ্ছিত শুধু নয়—একান্ত অরুচিকর মেয়েছেলেটা কেন, কোথা থেকে এসে তাঁদের সৌহার্দ্য ও প্রীতি দাবি করছে ?

চিনতে পারার পরও, প্রায় সকলেই উদাসীন হয়ে গেলেন।

দু-চারটি কথার পরই অন্য দর্শনপ্রার্থীদের ডেকে পাঠালেন বা কেরানীদের ডেকে ফাইলে মনোনিবেশ করলেন।

বরং ভদ্র ব্যবহার পেলো এককালীন নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছে থেকেই। তাদের সাহায্যেই খোঁজখবর নিয়ে জানল যে, তার চাকরি আজও আছে, অবেতন ছুটি মঞ্জুর ক'রে ক'রে টিকিয়ে রেখেছেন তাঁরা। এমন কি কিছু টাকাও পাওনা আছে, সেটা একটু হাঁটাহাঁটি ও তদ্বির করলে আদায় হওয়া অসম্ভব নয়।

অবসন্ন অপমানিত রুমা তাদের কাছেই অনুনয় জানিয়ে কাগজপত্রে সই ক'রে ভার দিয়ে গেল, যা মাইনে বা অন্য য়্যাকাউন্টসএ এই টাকাটা পাওনা আছে তা যেন তারাই আদায় করে দেয়।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করলে তাঁরাই আদায় ক'রে নিতে পারেন তাও জেনে নিল।

সেইসঙ্গে পদত্যাগপত্রও সই করে দিয়ে এলো একটা।

না।

চাকরি আর করবে না সে।

এখানে এ চাকরি তো নয়ই। যেখানে রাজরানী হয়ে ছিল বলতে গেলে —সেখানে চাকরানীর অধম হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ইতিহাসে আছে—মুঘলরাজবংশের পতনের সময় কোনো কোনো বাদশা দু এক বছর দুচার মাস মাত্র বাদশাহী করেছেন।

কিন্তু সে যাই হোক—বেগমে আর বাঁদীতে তাঁদেরও হারেম পূর্ণ থাকত।

বাদশার পতনের পর সে মহিলারা আর প্রাসাদে থাকতেন না—যমুনার ধারে মাসিক দশটি সিক্কা টাকা আয়ে খড়ের ঘরে দিন যাপন করতেন। সেও তাঁদের কাছে শ্রেয় মনে হ'ত।

এই পল্লীটিকে কে বা কোন্ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গরসিক নির্মম রসিকতা হিসেবে নামকরণ করেছিলেন—সোহাগপুরা।

এখানে এখন নতুন ক'রে চাকরি শুরু করার থেকে আত্মহত্যাও শ্রেয়।

আর এত অর্থের অভাব তার হয়ওনি।

স্বামীর কৃপাতেই সে এখন বেশ কিছুদিন স্বাধীনভাবে কাটাতে পারবে—সচ্ছলেও।

তারপর ?

ডিগ্রিটা তো আছেই। কোথাও একটা পেট চলার মতো চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে।

কোনো আশ্রমসংলগ্ন হাসপাতালে বিনা মাইনেতে চাকরি করলে খাওয়া পরার ব্যবস্থা তাঁরাই ক'রে দেবেন।

১০

এখানের কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার ছুটি।

এবার কি করবে?

দু-একটি ঐ কেরানী সহকর্মী, বিশেষ এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকই ওর হোটেলে যাওয়া আসা ক'রে আরও বাকী যে কাগজপত্র সই সাবুদ করা দরকার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন—তিনি পরামর্শ দিলেন, এখানে চেম্বার খুলে বসতে। তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন এ আশ্বাসও দিলেন।

কিন্তু রুমার মন চাইল না।

চাকরি করা অন্য কথা।

প্র্যাকটিশ জমানো সহজসাধ্য নয়।

মনে যে স্থৈর্য থাকলে মানুষ নতুন ক'রে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা আর তার নেই। ডাক্তারী জ্ঞানও এতদিনের অনভ্যাস ও অর্ধ-অভ্যাসে মরচে ধরে গেছে।

নতুন ক'রে ঝালাতে হবে আবার।

তার মানে বই নিয়ে বসা আর বসে বসে রোগিণীদের জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষা।

সবচেয়ে বড় কথা—পূর্বপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হবে।

তারা একদা দেখেছিল রুমা সগৌরবে বহু লোককে উপেক্ষা অবজ্ঞা ক'রে যেন তাদের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটছে।

রূপের গর্ব, বিদ্যার গর্ব, অবস্থার গর্ব হয়ত রুমার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পেয়ে থাকবে, অন্তত তারা যে তাই মনে করত তা রুমাও জানে।

ওর অন্যমনস্কতাকে তাদের প্রতি অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য ভেবেছে।

আজ তারা দেখবে বিগতশ্রী, স্বাস্থ্যহীনা গতযৌবনা এক নারীকে—যার শুধু চেহারায় নয়, কথাবার্তাতেও পূর্বের সে শান আর নেই।

তারা অবশ্যই তাদের ব্যবহারে বাক্যে সেদিনের শোধ নিতে চাইবে।

অথবা পতিত্যাগিনীকে অবশেষে পতিই ত্যাগ করেছে বুঝে সহানুভূতির ছলে মজা দেখতে আসবে।

না, এখানে থাকতে সে পারবে না।

আর কী হবেই বা কতকগুলো পয়সা এই অজস্র অসুবিধায় ভরা হোটেল-গুলোকে দিয়ে।

এদের ম্যানেজার থেকে 'বেলবয়' পর্যন্ত ওত পেতে থাকে নানা উপায়ে অতিথিদের পকেট হালকা করার জন্যে, সেই জন্যেই বোধহয় তাদের টাকার বদলে কোনো স্বাচ্ছন্দ্য দেবার কথা মনে থাকে না, যারা পারে তারা আদায় ক'রে নেয়—ওরা সেক্ষেত্রেও দেয় খুব অনিচ্ছায়।

কি করবে তাহলে ?

মা বাবার কাছে ফিরে যাবে ?

না, ছিঃ ! এ মুখ আর তাঁদের দেখাবে না। তাছাড়া তাঁরা কোথায় আছেন তাও ঠিক জানে না, গত চার বছরে একটাও চিঠি দেয় নি।

কর্তব্য কি তা স্থির করে নিয়েছে সে এর মধ্যেই।

মুকুটকে খুঁজে বার করবে।

করবেই সে, তার জন্যে যদি সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে হয়, তাও ঘুরবে।

যদি সে আবার কোথাও ঘর বেঁধে থাকে তো আর কাছে যাবে না, দূর থেকে সে সুখী হয়েছে দেখে চলে আসবে।

আর যদি দেখে সেও ছন্নছাড়া জীবন কাটাচ্ছে—তাহলে তার পায়ে ধরে চোখের জলে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

তারপর ?

তারপর ঘুমের বড়ি আছে। আছে মা-গঙ্গার জল।

মৃত্যুর অনেক উপায় আছে পৃথিবীতে—যদি ইচ্ছা থাকে।

না, সেই ভবিষ্যতের কথা আজ আর সে ভাবছে না।

মৃত্যুতেও তার অনীহা কি আশঙ্কা নেই।

শুধু একবার স্বামীকে দর্শন ক'রে—সে দর্শনের পুণ্যে অনেকখানি পাপ

স্খালন ক'রে—যেতে চায় সে মৃত্যুর আগে।

খুঁজে বার করবে পৃথিবী ঘুরে—বলাটা যত সোজা—ঝোঁকের মাথায় সঙ্কল্প করা—কাজে নেমে দেখা গেল তত সোজা নয়।

একবার ভেবেছিল দিল্লী বোম্বাই ও কলকাতার বড় বড় দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে।

নিজের নামে না-ই দিল, মুকুটের ঠিকানা প্রয়োজন—তার বিশিষ্ট কোনো বন্ধু চায়, পার্সোনাল কলমে এই বিজ্ঞাপন দেওয়াই যথেষ্ট, তার চোখে না পড়ুক তার বন্ধুদের চোখে পড়লেই যথেষ্ট।

নামটা এমনই যে কাকে চাইছে পরিচিত লোকের মনে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

এ নামের বহুলোক বাঙালীর মধ্যে নেই—এতদিনের এত লোকের সঙ্গে পরিচয়ে সে বুঝেছে।

কিন্তু আর একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল যে চাকরি ছেড়ে এখানের দেনা-পাওনা চুকিয়ে চলে গেছে, মনের ধিক্কারেই সম্ভবত, অথবা স্ত্রীর ওপর অভি-মানে—সে অন্য শহরে গিয়ে চাকরি বা ব্যবসা নাও করতে পারে।

না করার সম্ভাবনাই বরং বেশী।

সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাই স্বাভাবিক।

চেনা মানুষের কাছ থেকে, নিজের মনের কাছ থেকেও।

করলেও পরিচিতদের মধ্যে থাকবে না।

দিল্লী বোম্বে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও তার পক্ষে প্রীতি-প্রদ হবে না।

মাঝখান থেকে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জল ঘোলা করা।

তবু সে দিল্লী থেকে বেরিয়ে শহরগুলোতেই ঘুরল অনেকদিন। শুধু বোম্বে মাদ্রাজ বাঙ্গালোর নয়—বরদা, নাগপুর ভূপাল রূরকেলা, ভিলাই, টাটা, গয়া, পাটনা।

অর্থাৎ অজস্র খরচ।

টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সে সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সচেতন।

গহনাগুলো আছে এখনও লকারে কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা আর সরকারী টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল—সব জড়িয়ে বাইশ হাজারও নয়।

বেছে বেছে কম দামী হোটেলগুলোতেই উঠছিল তাই, অনেক অসুবিধা সহ্য করেও। ধর্মশালাতেও থাকতে আপত্তি ছিল না, তবে সেখানে একা কোনো স্ত্রীলোককে রাখে না।

তবু যত কৃচ্ছ্র সাধনই করুক, অর্থব্যয় কম হয় না।

যেখানেই যাক—ইঞ্জিনীয়ারদের প্রয়োজন আছে এমন আপিস খুঁজে বার ক'রে খোঁজ করতে হয় মুকুটলাল নামে কেউ আছে কিনা।

সব জায়গায় একবারেই কিছু খোঁজ পাওয়া যায় না।

এক এক আপিসে দুতিন বারও যেতে হয়।

যানবাহনে বহু টাকা চলে যায় তাতে।

শেষে যখন টাকা একেবারেই শেষ হয়ে এলো, তখন শুধু যে নিজের চিন্তা দেখা দিল তাই নয়—স্বামীকে খুঁজে বার করার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত বোধ হলো।

গ্রীমদের গল্পের এক আঁটি খড়ের মধ্যে একটা ছুঁচ খোঁজার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

এক কাহন খড়ের মধ্যে একদানা সর্ষে খোঁজা?

না, আরও কঠিন।

এতবড় দেশ, এত শহর—এত লোক। কোথায় খুঁজবে, হয়ত খুব কাছেই কোথাও আছে, কিন্তু কোন্ সূত্র ধরে তাকে বার করবে?

এর মধ্যে বদলোক যে কেউ ওকে ঠকাবার চেষ্টা করে নি তা নয়—কেউ কেউ ঠকিয়েছেও কিছু কিছু।

ওর মুখ দেখে, ওর আকুলতা দেখে 'দোহনযোগ্যা' বলে বুঝতে এই শ্রেণীর লোকের দেরি হয় না।

খোঁজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, খোঁজ করার উৎসাহ দেখিয়ে অনেক টাকা বার করে নেয়।

তাদের আন্তরিকতা অকৃত্রিম বলেই বোধ হ'ত প্রথম প্রথম।
আমেরিকান উপন্যাসে 'সাকার' শব্দটা পেয়েছে এর আগে।
সে যে নিজেই সেই সাকার বনে গেছে—তা ভাবে নি, বোঝে নি।
বুঝল অনেক পরে, ততক্ষণে বহু প্রতারক তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।
রূপ যৌবন আজ অতীতের স্মৃতি হতে চললেও—সেদিক দিয়েও বিপদ এসেছে বৈকি কিছু কিছু।
একা স্ত্রীলোক যে এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও এত অসহায় তা আগে তো কোনোদিন বোঝে নি।
ক্রমশ যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে সে।
আবারও সেই লণ্ডনের শেষ দিনগুলোয় ফিরে যায়—যখন জীবনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ছিল না।
কোথাও কোনো আশা বা একটুখানি সুসম্ভাবনাও দেখা যায় নি।

কোথায় এখন যাবে ? কোথায় খুঁজবে মুকুটকে ?
যদি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকে ?
এখন যেন মনে হয় সেই সম্ভাবনাই বেশী।
একেবারে হারিয়ে গেল জীবন থেকে—ওকে অতলগর্ভ এক অন্ধকার আর অন্তহীন শূন্যতায় ফেলে—একথা মন মানতে চায় না কিছুতে।
সেই জন্যেই এই শেষ সম্ভাবনাটুকুকে আঁকড়ে ধরে।
ভাবে আশ্চর্য, এতদিন কেন মনে হয় নি কথাটা।
আবার পরক্ষণেই ভাবে, তাতেই বা কি হত। সে তো আরও কঠিন খুঁজে বার করা।
সারা ভারতে লক্ষাধিক মঠ ও আশ্রম। তার সঙ্গে বিপুল হিমালয়ের সংখ্যাতীত গুহা-গহ্বর আশ্রয়।
এরমধ্যে কোথায় খুঁজবে সে।
অর্থবল থাকলেও সম্ভব হত। তাহলে চারিদিকে লোক লাগাতে পারত অন্তত।

সে একা কি করবে ?

তবু অনেক ভেবে রুমা হিমালয়ের দিকে যাওয়াই স্থির করে।

কোথাও খুঁজতে যে যেতেই হবে ওকে।

নইলে আর বাঁচবার কোনো কারণ বা অবলম্বন থাকবে না।

থাকবে না কোথাও এতটুকু আলো।

যতদিন পারবে খুঁজবে সে মুকুটকে।

তারপর ? ওদিকে মেয়েদের সন্ন্যাস নেবার ব্যবস্থাও আছে।

মা গল্প করেছিলেন, তাঁর প্রথম বয়সে কুম্ভমেলায় গিয়ে সন্ন্যাসিনী তো দেখেই ছিলেন, ন্যাংটা সন্ন্যাসীদের মতো বিবস্ত্র সন্ন্যাসিনীও কিছু দেখেছিলেন।

তেমন কোনো সন্ন্যাসিনীদের মঠে বা আখড়ায় কি স্থান হবে না ?

দ্বারকা থেকে হরিদ্বারের পথে কি মনে ক'রে—রুমা দু-তিন দিনের জন্যে বৃন্দাবনে নামল।

মনে বোধহয় একটা বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি দেখা দিয়েছিল—মুকুটের বাবারা বৈষ্ণব ছিলেন, মুকুটের নিজেরও সেই দিকে ঝোঁক।

যদি বৃন্দাবনে গিয়ে থাকে।

বৃন্দাবনে কোথায় থাকবে—এ ভয়ও ছিল। যত বড় তীর্থ এদেশে, তত পাপ পুঞ্জীভূত।

কাশী ও বৃন্দাবন এ বিষয়ে সর্বাধিক বিখ্যাত।

কিন্তু দৈবক্রমে ও যখন ধর্মশালা বা হোস্টেল খুঁজে বেড়াচ্ছে—রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউসে নিঃসঙ্গী কোনো স্ত্রীলোকের থাকার নিয়ম নেই—লণ্ডনের পরিচিত এক ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

খুবই সামান্য পরিচয়—তবু তিনি যে চিনতে পারলেন তাই নয়, ওর অসহায় অবস্থা অনুমান ক'রে নিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খোঁজ নিলেন এবং তাঁরা যে অতিথি-ভবনে ছিলেন সেখানেই একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

তাঁরা এসেছেন এখানে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি নিয়ে গবেষণা করতে, রাশি রাশি

পুঁথি নষ্ট হচ্ছে, সেগুলো উদ্ধার করতেও।

দু'জন ইংরেজ ও একজন বাঙালী অধ্যাপক বৎসরাধিককাল এখানে নিরামিষ প্রসাদ খেয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

নিষ্ঠার সঙ্গে অপস্যার মতো ক'রে বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

দু-তিন দিন থাকার কথা—কিন্তু এই ইংরেজ ভদ্রলোকের সহৃদয়তাকে ঈশ্বরের ইঙ্গিত মনে ক'রে সাত-আট দিন থেকে গেল।

ঘুরলও সে প্রায় প্রতিটি বড় বড় মন্দির, খোঁজ ক'রে ক'রে বৈষ্ণবসাধুদের আশ্রমও ঘুরল। পানিঘাট, ধীরসমীর, যমুনাপুলিন, যমুনার ধারে ধারে কত সব আখড়া, কত আশ্রম—পুরনো শহরেই বেশী—অনেকগুলোই ঘুরল। শেষে যখন ও আবারও ঈশ্বরের ইঙ্গিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, সত্য সত্যই যেন তাঁর একটা ইঙ্গিত বা নির্দেশ এসে পৌঁছল এবার।

পুরনো শহরে বঙ্কুবিহারীর পিছনেই রাধাবল্লভের মন্দির।

এ মন্দিরটি, বড় ভালো লেগেছে রুমার। বিগ্রহের বৈদূর্যমণির চোখ, তুমি যেদিকেই চাও মনে হবে তোমার দিকে চেয়ে আছেন।

ওরই মধ্যে একটু নির্জনও।

এখানে আসেন স্থানীয় ভক্ত—ব্রজবাসীরাই বেশির ভাগ। ফ্যাশনেব্ল একদিনে-বৃন্দাবন-দর্শনকারী ভিড় এসব মন্দিরে পৌঁছয় না।

রুমা এই বিগত আটদিনে তিনবার এলো এ মন্দিরে।

শেষ দিনও দর্শন ক'রে কিছুক্ষণ কেঁদে বেরিয়ে আসছে, চোখে পড়ল একটি সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ শুভ্র-কেশশ্মশ্রু বৃদ্ধ ব্রজবাসী এক কোণে বসে গুনগুন ক'রে কি গাইছেন যেন।

কাছে এসে শুনল, তিনি একটি ভজনই গাইছেন, সম্ভবত সুরদাসের। আপন মনে তন্ময় হয়ে গাইছেন, হাতের তুড়ি ছাড়া কোনো যন্ত্র নেই, দুই চোখে অবিরল ধারে জল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তাঁর দৃষ্টিও অর্ধ-নির্মীলিত—অর্থাৎ ভগবানকে

বাইরে খুঁজতে ব্যস্ত নন, নিজের অন্তরেই তাঁকে দর্শন করছেন।

গলা হয়ত খুব একটা মিষ্টি নয়, বার্ধক্যের শ্লেষ্মা-ধরা গলা—তবু গাইবার ধরনেই বড় মধুর লাগল রুমার।

সেও পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল—তারও কখন দু' চোখের কূল ছাপিয়ে পুনশ্চ জল ঝরতে শুরু করেছে সে বুঝতেও পারে নি।

সম্বিৎ ফিরল যখন বৃদ্ধ গান থামিয়ে 'রাধে রাধে' বলে উত্তরীয়ের প্রান্তে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন, তখনই।

রুমা সেইখানে, সেই বহু লোকের আসা-যাওয়ায় কর্দমাক্ত পদচিহ্নের ওপরই, সাষ্টাঙ্গে পড়ে তাঁকে প্রণাম করল।

বৃদ্ধ যেন সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে এদেশী হিন্দুস্থানী ভাষায় বলে উঠলেন, 'আরে, আরে, কে মা তুমি—এমন ক'রে আমাকে অপরাধী করছ! দেব-মন্দিরে বিগ্রহ ছাড়া আর গুরু ছাড়া কাউকে তো প্রণাম করতে নেই। আর প্রণাম করা যায় নিজের মাকে। তাছাড়া এ ব্রজমণ্ডল—এখানে প্রণম্য এক উনিই।'

তারপর রুমা উঠে দাঁড়াতে ওর ক্লিষ্ট ক্লান্ত শীর্ণ অশ্রুধৌত মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'বা বা, আহা মরি মরি—এ কি বেশে দেখা দিলি মা রাধারাণী। বলিহারি বলিহারি, আমার নাম নেওয়া সার্থক। কিন্তু মা—তোমার ব্রজকিশোর তো এখানে নেই, তিনি তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন গঙ্গাতীরে। কোনো এক নিভৃত স্থানে বসে তোমার কথাই চিন্তা করছেন। যাও মা, তুমি হরিদ্বার চলে যাও, কনখল সতীঘাটে কিংবা ওপারে নীলধারার পথে পথে খুঁজে দেখো, সেখানে না পাও উত্তর-কাশী চলে যেও। তুমি কেন কাঁদছ রাধে—তোমার জন্যে স্বয়ং রাধাবল্লভ যে কেঁদে আকুল হচ্ছেন। যাও যাও, সেখানে গুরুরও দেখা পাবে মা—আমি তোমার ললাটে রাধারাণীর আশীর্বাদ পড়তে পারছি। যাও তুমি, কালই চলে যাও।'

আবারও আছড়ে তাঁর পায়ে পড়েছিল রুমা—কিন্তু উঠে চোখ মেলে

আর তাঁকে দেখতে পেল না ; যেন ঐ থামগুলোর ছায়াতেই কোথায় মিলিয়ে গেছেন তখন।

আর দেরি করল না, আর ইতস্তত করল না।

তার রাধাবল্লব তার জন্যেই কেঁদে আকুল হচ্ছেন—এরপর আর দ্বিধা কি সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই।

বৃদ্ধ পাগল ? অথবা অত্যন্ত চতুর—ওর অবস্থা দেখে ওর দুঃখের কারণটা অনুমান ক'রে নিয়ে স্তোক দিয়ে গেলেন ?

মিথ্যা আশ্বাস ?

না। ও সে কথা মানতে রাজী নয়।

অনেক মানুষ দেখেছে সে।

অনেক সন্ন্যাসীও দেখল এ কদিনে। এ মানুষকে চিনতে ভুল হয় নি ওর।

এ যদি মহাপুরুষ মহাভক্ত না হয়—তাহলে পৃথিবীতেই ও রকম কোনো লোকের অবস্থান সম্ভব নয়।

ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বোধহয় শেষ হয়েছে—সেই কারণেই ঐ মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন গোবিন্দ—ওকে হাত ধরে ওর অন্তর-দেবতার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

১১

মুকুটের ধৈর্য প্রায় ফুরিয়ে এসেছে এবার।

আর সে সেই কোনো এক অজ্ঞাত দ্বিতীয় পক্ষর জন্যে, সংসারের পুনরভিনয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না।

মুশকিল হয়েছে এই—এর মধ্যে গুরুদেবও তার কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছেন—আর একদিনও দেখা পাচ্ছে না সে।

সে এ ক'দিনে মনস্থির করে ফেলেছে, এবার ওঁর দেখা পেলে আর ওঁর পা ছাড়বে না।

উনি যতই যা বলুন, সে আর ভুলছে না।

সে রাজঘাটে এক পাণ্ডার বাড়ি একখানা ঘর ভাড়া ক'রে আছে, ঐ পাণ্ডার স্ত্রীই তাকে দুবেলা রেঁধে দেন, চা জলখাবারও দেন।

সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই।

অবশ্য শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব আজকাল আর তাকে কোনো দুঃখ দিতে পারে না।

এই দু-তিন বছরের অবিরাম ভ্রমণ—সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত লোকের মতো—তাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে, আনন্দও দিয়েছে।

বাতানুকূল গাড়ি কিংবা প্লেন—এ ভ্রমণের থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে খাওয়া, তাদের সঙ্গে থাকায় অনেক সুখ।

কোথাও কোথাও বেসুর যে বাজে না তা নয়, তবে তেমন ব্যাঘাত তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সমস্ত জীবনানন্দে।

না, দৈহিক জীবনযাত্রার দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, অসুবিধা মনেই।

এভাবে একা অপরিচিত লোকের মধ্যে—লোক ভালো, তারা যত্নও করছে খুব—নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছে না সে আর।

এক এক সময় হাসিও পায়, তবে কি সে তার অপরিচিতা অনাগতা নব-বধূর জন্য তপস্যাই করছে ?

এ অবস্থায় অন্য কোথাও চলে যেতে পারে স্বচ্ছন্দে, আর তাই তো যাওয়া উচিত, আগে হলে চলেই যেত—কিন্তু মুশকিল হয়েছে—কোথায় যাবে ! যেখানেই যাক—এই চিন্তা, এই শূন্যতা কি সঙ্গে যাবে না ! যে স্ত্রী তাকে ত্যাগ ক'রে গেছে, যার কাছ থেকে প্রথম দু-তিনটি বছর ছাড়া পেল না কিছুই—যে শুধু আঘাতই করে নি, অপমানেরও চূড়ান্ত করেছে—তাকেই সে ভুলতে পারছে না যে কিছুতে।

একেই কি ভালবাসা বলে ?

যথার্থ ভালবাসা !

ঘৃণা লজ্জা ভয় অপমান কোনো বোধই থাকে না যাতে ?

যে ভালবাসায় শ্রীরাধা শতবর্ষ ধরে কেঁদেছেন তবু শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন নি, তাঁর সম্বন্ধে কোনো কটু বাক্য উচ্চারণ করেন নি !

কে জানে।

কে জানত জীবনে বইয়ে পড়া এসব ভালবাসার কথা নিজের জীবনে পরম দুঃখে বুঝতে হবে !

এর মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে একদা বোম্বেতে বসে শুনেছে রুমা লণ্ডনের রাস্তায় মাতলামি করেছিল—পুলিশ তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়েছে, এই প্রথম অপরাধ এবং ভারতীয় মহিলা বলেই।

বিতৃষ্ণায়, ঘৃণায় মন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মুকুটের তা হয় নি, আশ্চর্য এক অজ্ঞাত কারণে মানববুদ্ধির অগোচরে নিজেকেই এর জন্যে দায়ী, অপরাধী মনে করেছে।

তবে সে সন্ন্যাস নিতে চায় কেন ?

এ প্রশ্ন নিজেকে করেওছে সে বারবার।

তার উত্তর ঠিক স্পষ্ট কিছু খুঁজে পায় নি।

এই দীক্ষা বা সন্ন্যাস-এর মধ্যে কি শান্তি সে খুঁজে পাবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট

কোনো ধারণাও নেই।
তবে কেবলই যেন মনে হয়—উনি মহাপুরুষ, মহাতপস্বী—উনি এই অশান্ত মনকে শান্ত সংহত করতে পারবেন।
যাঁর কাছে গেলে—পৌঁছতে পারলে জীবনে কোনো ক্ষুধা, কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না—যিনি চরম ও পরম আশ্রয় মানুষের—তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে না পারুন, পথ দেখাতে পারবেন না ?

তবু এক সময় যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে এই অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন, এই আশাহীন প্রতীক্ষা—মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবে বুঝি এইবার, অথবা পাগল দেখেই গুরুদেব তাকে এইভাবে বোকা বুঝিয়েছেন—তখনই একদা অপ্রত্যাশিতভাবে সংবাদ এলো, সেই 'বাবা' তাকে স্মরণ করেছেন।
খবর দিলেন পাণ্ডাজীই।
বাবাকে তিনি চেনেন—অথবা বলা উচিত চেনেন না। পাণ্ডাজী দেখেছেন, যেমন দেখেছে আরও অনেকে, ওঁকে দেখলে সকলেরই ভক্তি হয়, কিন্তু উনি কে, কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু, ওঁর গুরু কে, কোন্ মঠ বা আশ্রমে থাকেন কেউই জানে না।
উনি হঠাৎই আসেন, হঠাৎই অদৃশ্য হন। লোকে বলে গভীর অরণ্যে বা পাহাড়ে গিয়ে কঠিন তপস্যা করেন।
তবে নীলধারার কাছে কি এদিকে গঙ্গার ধারে দিনরাত একভাবে বসে থাকতে অনেকেই দেখেছে—শীতে, বর্ষায়, ঐ এক উত্তরীয় ছাড়া কিছু নেই ওঁর।
কোথায় খান, কী খান, তাও কেউ জানে না।
ভক্তদের আদৌ কাছে ঘেঁষতে দেন না। বিশেষ ঐ তথাকথিত ভক্ত, মহাপুরুষ-অন্বেষী যারা—এমন শক্তিশালী গুরু চান—যিনি শুধু ভবার্ণবে ত্রাণ করবেন না, ইহলোকেও ঐশ্বর্য সম্পদ প্রাপ্তি বা মামলা জেতার উপায় করতে পারবেন।
এঁরা কেউ প্রণাম করতে গেলে উঠে হনহন ক'রে চলে যান, প্রশ্ন করলে,

উত্তর দেন না।

তবে এই 'মহাৎমা' যে মুকুটের প্রতি প্রসন্ন সেটা পাণ্ডাজী জানেন। কারণ তিনিই ওকে ডেকে মুকুটকে বাড়িতে রাখতে বলেছেন। সেজন্যে প্রথম প্রথম তিনি কোনো খরচাই নিতে চান নি, শেষে মুকুট মিথ্যে করে 'বাবা' তাকে একশো টাকা ক'রে দিতে বলেছেন বলায় তবে নিতে রাজী হয়েছেন।

কিন্তু তিনি যা যত্ন করেন এবং যা খরচা করেন মুকুটের জন্যে, তাতে এক-শো টাকা কিছুই না—কিন্তু মুকুট জানে এর চেয়ে বেশী দিতে গেলে পাণ্ডাজী সন্দেহ করবেন হয়ত—বাবাকে প্রশ্ন করাও আশ্চর্য নয়।

বাবা নাকি ওপারের এক গুজারকে দিয়ে খবর ভেজেছেন—মুকুটবাবু, কাল সকালে নীলধারার কাছে যেখানে বাবা বসেন সেখানে গেলে ওঁর দর্শন পাবেন।

সংবাদটা এতই আকস্মিক, এত অতর্কিত যে উত্তেজনায় আশায় মুকুটের সারারাত ঘুমই হলো না।

তবে কি বাবা বুঝেছেন যে আর সংসার করা সম্ভব নয় মুকুটের পক্ষে, উচিতও নয়।

সেই জন্যেই দীক্ষা ও সন্ন্যাস দেবার সঙ্কল্প করেছেন!

সে ভোর চারটেয় উঠে প্রাতঃকৃত্য এমন কি স্নান পর্যন্ত সেরে কিছু ফুল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

একটা কিছু ফল নিয়ে যাওয়া উচিত হয়ত—কিন্তু তখন আর তা কোথায় পাবে।

শুধু এই ফুলই তাঁর পায়ে দেবে মুকট।

পাণ্ডার স্ত্রী তাকে অন্তত একটু চা খেয়ে যেতে বললেন, 'আধা মিনিটমে' ক'রে দেবেন এমন আশ্বাসও দিলেন। কিন্তু মুকুট রাজী হলো না। বললো, 'কেয়া জানে বাবা সায়েদ আজ দিক্ষা দে দেগা তো! আভি কুছ নেহি খায়েঙ্গে।'

সেই প্রথম দিনটি যে পাথরে যেভাবে বসেছিলেন সেই সন্ন্যাসী, আজ এই প্রত্যূষেও ঠিক সেইভাবে বসে আছেন, তেমনি পাথরেরই মতো স্থির নিস্পন্দ, অপলকনেত্র।

মুকুটের মনে হলো বোধহয় সারারাতই উনি এইভাবে বসে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে—ওঁর দৃষ্টি এমন কোনো দর্শনীয় বস্তুতে আবদ্ধ যে, দিনরাত্রের পরি-বর্তন, আলো এবং অন্ধকার কিছুই ওঁর চোখে পড়া সম্ভব নয়।

মুকুটের এ ধ্যান ভাঙাতে সাহস হলো না।

তাছাড়া সে জানে, এর মধ্যে বুঝে নিয়েছে—উনি যখন ডেকেছেন তখন উনিই এক সময় চোখ খুলবেন।

সময় হলেই খুলবেন হয়ত—সে সময়ও উনি জানেন।

তবে সেদিন অনেক সময় লাগল ওঁর চোখ খুলতে। হয়ত এত সকালে মুকুটকে আশা করেন নি উনি।

কিংবা এমন এক অতলান্ত মাধুর্য কি জ্যোতিতে মন ডুব দিয়েছিল সেখান থেকে এত হিসেব ক'রে তা ফেরানো যায় না। এত হিসেবও থাকে না।

এ পৃথিবীর কথা, এ পৃথিবীর অসংখ্য অগণন মানুষের মধ্যে তুচ্ছ এক মুকুটলালের কথা মনে রেখে সে জ্যোতিঃসমুদ্রে ডুব দেওয়া যায় না।

মানুষের চার যুগে না কি ব্রহ্মার পলক পড়ে। যে ব্রহ্মের ইচ্ছায় ঐ চতুরাননের জন্ম—তাঁর কোনো সময় নেই, সময়ের কর্তব্যের হিসেব রেখে তাঁর সাধনা করা যায় না।···

প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর এক সময় ওঁর চোখের পাতা কেঁপে উঠল, পলক পড়ল আবার।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন জেগে উঠলেন।

আরও কয়েক মুহূর্ত পরে—মুকুট ওঁর পিছনে বসে অপেক্ষা করছিল—সেদিকে না ফিরেই বললেন, 'তুমি এত সকালে এসেছ। কিন্তু আরও কিছু-ক্ষণ বোধহয় অপেক্ষা করতে হবে। তুমি কিছু খেয়ে আসো নি বোধহয়! ···এত তাড়া করবে জানলে তোমাকে বলেই দিতাম আটটা নাগাদ আসতে।'

মুকুট এসব কথার কোনো উত্তর দিল না।

সে ফুলগুলো এনে ওঁর দু' পায়ে ঢেলে দিয়ে সেই জলের উপরই হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম ক'রে বললো, 'আর যে পারছি না বাবা, এবার আমাকে মুক্তি দিন। আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন আমাকে সেবক ক'রে।'

মহাপুরুষ হাসলেন এবার।

মুকুটের মনে হলো ঐশ্বরিক অপার্থিব হাসি।

বললেন, 'তোমার মুক্তি বা বন্ধন যাই বলো এসে গেছে, সময় হয়েছে এবার, আর দেরি নেই। তাঁরও তপস্যা শেষ হয়েছে। কঠিন তপস্যা ক'রে-ছেন তিনিও। তিনি হরিদ্বারে এসে পৌঁছে গেছেন কাল, কালই তাঁকে সংবাদ পাঠিয়েছি। তাঁকে এখানে এনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করেছি। আর বোধহয় দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।'

প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে মুকুট, হাহাকারের মতো শোনায় ওর কণ্ঠ, 'তবে কি আমার মুক্তি হবে না বাবা? আবার সংসার করতে হবে, আবারও সেই নরককুণ্ডে ফিরতে হবে।'

'নরককুণ্ড আমরাই তৈরি করি, সেটা আমাদের মানসিক গঠন থেকে হয়। আর সংসারে ফেরা না ফেরা তোমাদের ইচ্ছা। যাঁর সঙ্গে তুমি মিলিত হতে যাচ্ছ এখন—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবেন, তাঁর মনও সেইভাবে তৈরি, তুমি লোকালয়ের বাইরে কোথাও গিয়ে বাস করতে কি তপস্যা করতে চাইলে তিনি বাধা দেবেন না।'

'কিন্তু বাবা, আপনার অগোচর তো কিছুই নেই—বরং আমিই গোড়ায় বুঝতে পারি নি—আমি যে এখনও আমার প্রথমা স্ত্রীকে ভুলতে পারি নি!'

'সে আমি জানি। ভগবান একই, ভক্ত যে-রূপে তাঁকে চায় যদি চাওয়া ঐকান্তিক হয় তাহলে সেই রূপেই পাবে তাঁকে। ঐ যে উনি পৌঁছে গেছেন।'

চমকে চেয়ে দেখল মুকুট।

সত্যিই একটি মহিলা বা নারী আসছেন।

জল ঠেলে গোল গোল পাথরের ওপর দিয়ে আসা।

অনভ্যস্ত পা বার বার পিছলে যাচ্ছে, পড়ে যেতে যেতে সামলে নিচ্ছেন, এক আধবার পড়েও গেলেন।

সঙ্গে একটি বছর চৌদ্দ-পনেরোর ছেলে আছে, এদেশী ছেলে, সে হাত ধরে আছে।

কিন্তু সব সময় সামলাতে পারছে না।

আর একটু কাছে আসতে চেঁচিয়ে কি বলতে গেল মুকুট। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না কোনোমতেই।.

বিস্ময়, অবর্ণনীয় আবেগ, আনন্দ, অভিমান, এতগুলো মনোভাব একসঙ্গে প্রকাশের পথ খুঁজে গলার কাছে ঠেলাঠেলি করছে বলেই কোনোটা প্রকাশ করা গেল না।

যে আসছিল সে আর একটু কাছে এসে মুখ তুলতেই মুকুটকে দেখতে পেল।

তারও কি ঐ এক অবস্থা!

কয়েক পলকের জন্যে অনড় হয়ে গেল, সেও বোধহয় কিছু বলার চেষ্টা করল কিন্তু ঠোঁট দু'টো নড়লই শুধু—গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না।

তারপরই পাগলের মতো ছুটে আসতে গেল—তখন আর অল্পই পথ বাকী ছিল—তবু তাতেই বার দুই আছাড় খেল, হয়ত খুবই লাগল পায়ে, হয়ত কেটে গেল—কিন্তু সে আর তখন কে লক্ষ্য করবে!

অবশেষে এক সময় কাছে এসে মুকুটের পায়েই আছড়ে পড়ল, ওর পা দুটোয় মুখ ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, 'ওগো, আমাকে মাপ করো, এবার মাপ করো, আমি যে আর পারছি না। শুধু তোমার কাছে ক্ষমা চাইব বলেই প্রাণটাকে নষ্ট করতে পারি নি।...কিন্তু আর পারছি না!'

'রুমা! রুমা! এ কি করছ। ওঠো ওঠো ছিঃ...লক্ষ্মীটি, অমন করো না। আমারও যে অনেক মাপ চাইবার আছে। তুমি ওঠো, মুখ তোলো—'

ছেলেমানুষের মতো, পাগলের মতো যেন আবোল-তাবোল বলতে থাকে মুকুট। তারও দুই চোখে জল তখন, গলাটা আর যেন ওর আয়ত্তে নেই,

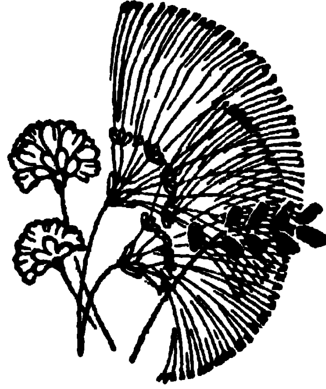
আর কে যেন কি বলছে, বলাচ্ছে।
এ অবস্থায় গুছিয়ে কোনো কথা বলা সম্ভব নয়।
প্রয়োজনও নেই।
যারা এই আবেগ এই জীবনাবর্তের সৃষ্টি করে নিজেদের ভুল ভ্রান্তি ভালবাসা দিয়ে—তাদের প্রয়োজনও হয় না অর্থবদ্ধ সুসম্বন্ধ বাক্যের। একজনের আবেগ দিয়ে আর একজনের আবেগ বুঝে নেয় তারা।

পিছন থেকে এবার সেই আত্মস্থ সন্ন্যাসীই ধীরে ধীরে ডাকলেন, 'রুমা!'
ভূত দেখলে কি মানুষ এমনি ক'রে চমকায়!
মুকুটের দুই হাতের বন্ধন খুলে চমকে এদিকে তাকায় রুমা—
'বাবু! তুমি। তুমি বেঁচে আছ!'
তারপর সেও সেই সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে পড়ে।
'তোমার কাছে আমি যে অপরাধ করেছি, তারই শাস্তি বুঝি ভগবান আমাকে এতদিন ধরে এমনভাবে দিলেন। পরিপূর্ণ সুখের সম্ভার থরে থরে সাজানো—তা সত্ত্বেও আমি আজ ভিখিরীর মতো পাগলীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি।'
'আমার কাছে অপরাধ। ভুল করছ রুমা, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার জন্যেই আমি সেই আনন্দ পেয়েছি, যে আনন্দ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, যার চেয়ে বেশী আনন্দ সুখ-শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এমন জিনিস আমি পেয়েছি —যার বেশী আর কেউ কিছু পেতে পারে না, যার থেকে বড় আর কিছু নেই। শুধু সেই ধন্যবাদ দেবো বলেই অপেক্ষা করেছি, মুকুটকেও ধরে রেখেছি এখানে।'
'কিন্তু—' ব্যাকুল হয়ে যেন কি বলতে যায় রুমা। অনেক কথা বলার আছে যে তার।
সন্ন্যাসী হাত তুলে বাধা দিয়ে বলেন, 'আর আমাকে কিছু বলার চেষ্টা ক'রো না। বহু দুঃখের পর দুজনে দুজনকে পেয়েছে—অগ্নি-পরীক্ষায় র্ণ হয়েছ দুজনে—এখন নিজেদের কথাই বলো আর শোনো। আমি

এখন অতিরিক্ত—two many নয় কি? চলি। তোমাদের কল্যাণ হোক!'

এই বলতে বলতেই তিনি চলতে শুরু করেছেন। তাঁর কাছে এ পথ বন্ধুরও নয়, আয়াসসাধ্যও নয়। এরা বিস্ময়ের বেগটা সামলে বাধা দেবার বা কিছু বলার আগেই ত্বরিৎ-গতিতে তিনি বহুদূর চলে গেলেন—দেখতে দেখতে এক সময় দূর পাহাড়ের পথে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন—আর দেখা গেল না।

হয়ত আর কোনোদিনই দেখা যাবে না।



বাস্তব ও স্বপ্ন

সাগরপারের গোপালপুর বা গোপালপুর-অন-সী এককালে ইউরোপীয়ানদের গরবিনী প্রেয়সী ছিল।

কালক্রমে তা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অঙ্কভাগিনী হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন সে দিনও তার গিয়েছে। ভ্রমণবিলাসী বা ট্যুরিস্ট মহলে সে বিগতযৌবনার মতোই উপেক্ষিতা।

যদি বা দামী হোটেল একটা আছে—তবে সেও কেমন চলে তা জানি না। সন্দেহ হয় চলে না।

বছর বারো-চৌদ্দ আর যাই নি। শুনেছি শহরটা একেবারেই মরে যায় দেখে সরকার তাঁদের কিছু কিছু আপিস ওখানে স্থানান্তর করেছেন। আগেকার মাঝারি হোটেলবাড়িগুলোও তাঁরা দখল করে নিয়ে বাড়িওয়ালাদের উপবাস থেকে রক্ষা করেছেন।

আমার একাধিকবারের আশ্রয়দাত্রী, এককালের প্রবল প্রতাপ হোটেলওয়ালী মিসেস মূরও এক মেয়ে-হোস্টেলকে তাঁর বাড়ি ভাড়া দিয়ে নিশ্বেস ফেলে বেঁচেছেন।

আমরা শেষবার যাই বোধহয় ঐ বছর বারো-চৌদ্দ আগে। সেবার ডাঃ দাসের বাড়ি 'দ্য বিকন'-এর নিচেরতলার একাংশে ভাড়া ছিলাম। (ডাঃ দাস অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ও বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুর।)

সমস্ত গোপালপুরের মধ্যে ঐ বাড়িটিই বোধহয় সবচেয়ে হিসেব করে তৈরি। যেদিন কোথাও হাওয়া থাকে না সেদিনও, এ বাড়িতে ঝড় বয়ে যায়। এখন শুনছি সে বাড়িরও নিচেরতলা কী একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ভাড়া নিয়েছে। কারণ স্পষ্ট—ট্যুরিস্টের অভাব।

আমাদের পূর্ব-পরিচিত হোটেলটি "ব্লু হ্যাভেন" উঠে গেছে শুনেই আমার এক বন্ধু আপিসের যোগাযোগে এই বাড়িটি ঠিক করেন।

কিন্তু তা হোক, পূর্ব আশ্রয়দাত্রীকে ভুলি নি। গিয়ে দেখা করে অভিযোগও জানিয়েছিলাম।

তিনি বিচিত্র ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলেছেন, 'হোয়াট ক্যান বি ড্যান মাই সন, ওনলি টু মনথস্ অফ সীজন্—য়্যাণ্ড দ্য রেস্ট— ইটিং মাড্।'

ভারতের মধ্যে ট্যুরিস্টের রাজা হলো গরিব বাঙালী। এঁরা এখানে বিশেষ আসতে চান না। কেন যে এঁদের পছন্দ হয় না, তাও জানি। এখানে কোনো তীর্থ নেই। সেই কারণেই হরেক রকমের পণ্যদ্রব্যের বাজার বসে নি।

বাঙালীর চাই রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা নয়—কলা কেনা। সেদিক দিয়ে কাশী, পুরী বা হরিদ্বার আদর্শ। তীর্থ যেমনই হোক, দেবতা যেমনই থাকুন —সে পর্বটা দু'এক টাকা প্রণামীর ওপর দিয়ে ম্যানেজ করে, পাণ্ডাদের বকে ধমকে টিটকিরি দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে মা-লক্ষ্মীরা লেগে যান রাশি রাশি বাজার করতে।

গোপালপুরে এসব কিছু নেই। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, নয়নাভিরাম ব্যাক-ওয়াটার আছে, সেই কারণেই মাছও প্রচুর। আর আছে নিবিড় শ্যাম নারিকেল বাদামের বন।

পুরীর মতোই ব্রেকার কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। এখানে স্নান করা অনেক নিরাপদ ও আরামদায়ক।

যাক গে ওসব কথা। গোপালপুরের প্রচার করতে ঐ গল্প ফাঁদি নি। আসল যা বলছিলাম, তাই বলি।

সেবারের গোপালপুর প্রবাসটা বহু দিক দিয়েই আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

যদিও বছরটা ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, এইটুকু শুধু মনে আছে হরিপদবাবুর ছেলে— রাষ্ট্রীয় এয়ারফোর্সের যে তরুণ অফিসারটি দেশরক্ষার কাজ করতে করতে শহীদ হয়েছে—সেই বছরই সবে স্কুলের পালা শেষ করবে

।লে তৈরি হচ্ছে। সেও তখন ওখানে।

।ন্ধ্যায় নিচে আসত আমার কাছে ভূতের গল্প শুনবে বলে, আর শুনতে ভয় পেয়ে কাছে ঘেঁষে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরত।

কিন্তু এ সবের সঙ্গেও আসল গল্পের সম্পর্ক নেই।

ওখানে সেবার চন্দন রায় আর অভিনেতা-কাম-চিত্র পরিচালক মৈনাক সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই নাটকীয় ব্যাপার একটা।

এমন নাটক জীবনে ঘটে দৈবাৎ, ঘটলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়—চলচ্চিত্রে বা মঞ্চেই শোভা পায়।

এদের দু'জনকেই আগে থাকতে চিনি, চন্দন তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো—তাও না, ভাইপো বলাই উচিত বয়সের যা ব্যবধান—তবে এত অন্তরঙ্গ বলেই ভাই বলে মনে হয়, বন্ধুও বলা চলে।

প্রথম দেখা চন্দনের সঙ্গেই।

আমাদের বাড়ির প্রায় সামনাসামনি জর্জ সাহেবের ছোট্ট এক হোটেল ছিল।

ঘরের মধ্য থেকে সমুদ্র দেখা যেত না। পাকা বাড়ি হলেও খড়ের চাল। তবু হোটেলটি সিজ্‌ন-এ প্রায় সব সময়ই ভর্তি থাকত। অনুগ্রাহকদের মধ্যে বেশীর ভাগই শিক্ষক-শিক্ষিকা। তার মধ্যেও ব্রাহ্ম বা ক্রীশ্চানই অধিকাংশ, যাদের পুঁজি কম অথচ একটু পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে চান।

জর্জ সাহেব আর তাঁর মেমই হোটেল চালাতেন, বাজার-সরকারী থেকে ম্যানেজারী, রান্না থেকে বাথরুম সাফ, সব। মেমই রান্না-বাড়া করতেন, বাঙালীপ্রিয়। 'মাছ-ঝোল-ভাত'ও শিখে নিয়েছিলেন।

একটি মাত্র ভৃত্য, সেও এই এতগুলি বোর্ডারের ফাই-ফরমাশ খেটে ওঁকে সাহায্য করার বিশেষ সময় পেত না।

যতবারই গোপালপুর গেছি দেখেছি জর্জ সাহেব (জর্জ নাম কি পদবী তা জানি না, সবাই জর্জ সাহেবই বলে) একটা খাকী হাফ প্যান্টের ওপর একটা হাতকাটা গেঞ্জি বা কখনও পুরোপুরি খালি গায়েই এটা-ওটা খুটখাট্ কাজ করে বেড়াচ্ছেন।

শুনেছি খুবই ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের ভদ্রলোক, আর দেখেছি (সেটাই সম্ভবত ওঁদের হোটেলের জনপ্রিয়তার মূখ্য কারণ) বাজারে ভালো ফল কিনতে।

মুদির দোকানেও তাই, বেশী দাম দিয়ে ভালো চাল, ভালো ডাল, ভালো মাখন মার্মালেড ছাড়া কিনতেন না। অথচ রেটও অন্যান্য মাঝারি হোটেলের তুলনায় কমই।

আমাকে বলতেনও—'আমার তো পেন্‌সন্ আছেই, তাতে কুলোয় না বলেই এটা করা। কোনোমতে দু'জনের খাওয়া-থাকার খরচটা চলে গেলেই আমি খুশী। বেশী লাভে আমার দরকার নেই।'

তবু যে আমরা কখনও ওঁর হোটেলে যাই নি, তার কারণ ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায় না।

সঙ্কীর্ণ বাগানের এক প্রান্তে এসে দাঁড়ালে তবেই ফেনোর্মিচঞ্চলা সমুদ্র চোখে পড়ত—কখনও মেঘবর্ণা, কখনও রৌদ্রকরোজ্জ্বল, গাঢ় নীলবর্ণা, কখনও বা শুক্লপক্ষের সহস্রচন্দ্র প্রতিবিম্বিতা।

এই জর্জ সাহেবের হোটেলের সামনেই সেদিন চন্দনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আগের দিনই পৌঁছেছি। সেদিনটা গেছে গোছগাছ করে থিতিয়ে বসতে —এইখান দিয়েই যাতায়াত করতে হয়েছে বার বার, তবু যে-কোনো কারণেই হোক, দেখা হয় নি।

অবশ্য এখানে দেখা হওয়ার প্রধান জায়গাটা সমুদ্রতীর—সেদিন তো আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

পরের দিন একটু 'নর্ম্যাল' হয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম জর্জ সাহেবকেই 'গুড মর্নিং' জানাতে। দেখি ওঁদের ফটকের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে চন্দন—না, সমুদ্র নয়, সামনের বাদাম গাছটার দিকে তাকিয়ে।

চন্দন বলতে গেলে আমাদের পাড়ার ছেলে। জায়গাটা এখন কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—নইলে স্বগ্রামবাসীও বলা চলত।

'আরে! চন্দন! তুমি এখানে! কবে এলে?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল চন্দন, দুই চোখে রাজ্যের ঔদা-সীন্য ও ক্লান্তি নিয়ে।

এখন মনে হলো মনটা বহুদূর থেকে কুড়িয়ে গুটিয়ে চোখে টেনে এনে আমাকে দেখল ও চিনতে পারল। চোখে-মুখে সবিস্ময় প্রসন্নতাও ফুটল একটু।

'মাস্টারমশাই! আপনি! ও, বাঁচলুম', বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

এই মাস্টারমশাই সম্বোধনের একটু ইতিহাস আছে।

পাড়া সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে ও মাসীমাই বলে। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্য একটা সম্পর্কও ছিল।

ছোটবেলায় মাস আষ্টেক-নয় ওকে পড়িয়েছিলুম। তখন অতটা বলত না, কিন্তু এখন আমাকে 'মাস্টারমশাই'ই বলে শুধু। মেসোমশাই আর বলে না।

ওর আসল শিক্ষক বা গুরু হলেন—হলেন মানে এখন বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিছুদিন আগেও ছিলেন—ওর অঙ্কের মাস্টারমশাই, বঙ্কুবাবু।

বঙ্কুবাবুকে ও গুরু কেন—বোধহয় ইষ্টের মতোই ভক্তি করত আর ভাল-বাসত, তাঁর কথায় প্রাণ দিতে পারত।

যদিও শুনেছি বঙ্কুবাবু কখনও ওর সে শ্রদ্ধার ওপর কোনো দাবি করে নি, জোর করে নিজের মত চাপাতে চায় নি।

কখনও কোনো কাজে বাধাও দেন নি।

আমি ঠিক আলিঙ্গন না করলেও ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'তুমি কি একা এসেছ? না আর কেউ আছেন? মা-বাবা এসেছেন নাকি? উঠেছ কোথায়?'

'এখানেই উঠেছি, এই জর্জ সাহেবের হোটেলে। এঁর কথা আমাকে এক অফিস বস্ বলে দিয়েছেন। না, মা-বাবাকে আনি নি। ভাড়া পেতুম ওঁদেরও—কিন্তু ওঁরাই আসতে চাইলেন না। মা আমার ভাই-বোনদের ছেড়ে আসতে চান না, বাবার অনিচ্ছা অন্য কারণে। সে তো আপনি

জানেনও—আমার কাছে কোনোমতেই ওবলাইজ্‌ড থাকতে চান না।'

তারপর একটু ম্লান হেসে বললো, 'ওঁদের আনলে কি আর এখানে ওঠা যেত? মা কী রকম গোঁড়া জানেনই তো। তাঁদের আনলে পুরী যেতে হ'ত।'

তারপরই আমার কথাটা মনে পড়ল বোধহয়, 'আপনি উঠেছেন কোথায়? ও, ডাঃ দাসের বাড়ি? শুনেছি ত্ব বেস্ট হাউস। মাসীমারা এসেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, সবাই। ছেলে-মেয়েদের নিয়েই এসেছি। চলো না, ওখানেই চা-টা খাবে—'

'আপনি যে কী কাজে যাচ্ছিলেন?'

'না না, কাজে নয়। জাস্ট জর্জ সাহেবকে গুড মর্নিং জানাতে। সে পরে হলেও চলবে।'

'না মাস্টারমশাই, আজ এখন থাক। এখানে কিছু বলা নেই, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে। এঁরা খুব দুঃখিত হন বোর্ডাররা কেউ না খেলে।··· তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সে একটু নিরিবিলি না বসলে চলবে না। বরং আপনি যদি একটু বেড়াতে বেড়াতে এক সময় আসতেন তো বড় ভালো হ'ত। এলে কিন্তু হাতে সময় রেখে আসবেন।'

'ঠিক আছে। একটু পরেই আসব। বাজার আমার হাতে নেই, খোকাই করবে। আমি শুধু ওদিকটা ঘুরে এসে বাড়িতে চা-খাবার খেয়ে তোমার কাছে এসে বসছি।'

তখন আর অনর্থক জর্জ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলুন না। একটু পরে তো আসতেই হবে।

মিসেস মূরের সন্ধানে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাজারে আসার ওঁরও আর দরকার নেই। শুনেছি এই জর্জ সাহেবের কাছ থেকেই লাঞ্চ, ডিনার যায় ওঁর। তবু এ সময়টায় রোজ একবার করে আসা চাই-ই। এটা নাকি ওঁর প্যাসনে দাঁড়িয়ে গেছে অনেক।

ঘুরে খুব সস্তা পেলে কেনেন, একছড়া কলা কিংবা কয়েকটা বেগুনফুলি আম।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ফলের বাজারেই দেখা হয়ে গেল মিসেস মূরের সঙ্গে।

তেমনি একটা মোটা লাঠিতে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। আমাকে দেখে—বিশেষ তাঁকেই খুঁজতে এসেছি শুনে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর।

আমি যে তাঁকে মনে রেখেছি এতদিন পরেও—স্রেফ এই আনন্দে। অনেক কুশল প্রশ্ন করলেন, বন্ধুদের খোঁজ নিলেন। আমার স্ত্রী এসেছেন শুনে, একদিন অচির ভবিষ্যতে আমাদের ওখানে দেখা করতে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আমাদের যেতে বললেন না, সম্ভবত বসিয়ে চা খাওয়াবার জায়গাটুকুও রাখেন নি।

একটি নুলিয়া ভৃত্য আছে, সে সারাদিন থাকে, রাত্রে বাড়ি চলে যায়—খাবার তো জর্জ সাহেব পাঠান।

কদাচিৎ ছেলে-বৌ এলে জর্জ সাহেবের কাছেই থাকে।

বাজারে আর ঘোরার প্রয়োজন ছিল না।

আমি নাকি বেহিসেবী খরচা করি। তাই ছেলে এবার সব ভার নিজের হাতে নিয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হয়েই বাসার দিকে ফিরছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি পরিচিত মুখ।

পরিচিত—তবু মনে করতে মিনিট দুই সময় লাগল।

একদা অত উজ্জ্বল মুখ এত মলিন দেখব ভাবি নি বলেই দেরি লাগল।

মৈনাক সেন।

না, আমাকে চেনার কোনো কারণ নেই তাঁর।

আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, আমি তাঁর কোনো 'ফ্যান'ও নই যে ঠিকুজি-কুলজি মুখস্থ রাখব।

আমি ভিন্ন জাতের মানুষ। যদিও লিখিটিখি একটু-আধটু, কিন্তু সে লেখা তাঁদের চোখে পড়বে, তা আশা করি না।

ফিল্মের জন্যে লিখিও না। ছাঁচে ফেলা লেখা আমার তেমন আসে না। যাদের আসে—তাদের যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে লেখক হিসেবে, তাও দেখেছি সুতরাং ও চেষ্টাও করি না।

যারা ফরমাশী লেখা লিখে দু' পয়সা করে খাচ্ছে তাদের ঈর্ষাও করি না। মোটা টাকা বাঙালী লেখক পায় না, মানে কলকাতায় পায় না—ঈর্ষা করব কেন? "শুধু নহি উৎসুক"।

তবে মৈনাক সেনকে কে না দেখেছে বা না চেনে?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'টক অফ দ্য টাউন' ছিলেন।

বিখ্যাত অভিনেতা, বিখ্যাত মদ্যপ, বিখ্যাত প্রেমিক (লম্পট শব্দটা ঠিক ওঁর বেলায় প্রযোজ্য নয়), কুখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।

কুখ্যাত বলছি ইচ্ছে করেই।

কারণ এই শেষটাই কাল হলো লোকটির।

অভিনেতা হিসেবে এককালে যে বিপুল খ্যাতি হয়েছিল তা কমতে দেরি লাগত। যেটুকু অবশিষ্ট থাকত তাতে আরও বেশ কিছুদিন মদ্যপানটা চলবার কথা।

কিন্তু ওঁর হঠাৎ মনে হলো—পরিচালক প্রযোজকরা ওঁর প্রতি অবিচার করছে। নিজেই গেলেন ছবি পরিচালনা করতে। তার চেয়েও যেটা মূঢ়-তার কাজ—নিজেকে হিরো করে গল্প লেখালেন।

ফরমাশী গল্প। নতুন প্রণয়িনীকে হিরোইন দিয়ে।

সে ছবিতে যথাসর্বস্ব ডুবল। তাতেও চৈতন্য হলো না। যেখানে যত ঘাঁটি ছিল সব জায়গা থেকে ধার করে আর একবার বাঘের খেলা দেখাতে গেলেন।

এবার অন্য একজনকে 'হিরো'—তরুণ নায়ক করেছিলেন, মাঝারি রকমের নাম করা কিন্তু গল্প তৈরি করেছিলেন একপেশে, মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোককে কেন্দ্র করে, আর বলা বাহুল্য, সে ভূমিকা নিজেই নিয়েছিলেন ফলে ভরা-ডুবি।

আর এখন পার্টও পান না, ছবি নিজে তুলবেন সে ক্ষমতাও আর নেই৷ ওঁর নতুন প্রিয়াও আর নেই—স্বভাবতই যাদের খ্যাতি মধ্যগগনে তেমনি একজনকে ভর করেছে .

এসবই আমার শোনা, তপু-দীপু – ভাইপোদের মারফত।

বিশেষ তপু। কাজের কথা গুরুত্ব নির্বিশেষে ভুলে যায়—কিন্তু ফিল্ম জগতের কথা একটাও ভোলে না। তারকাদের নাড়ি-নক্ষত্র ঠিকুজি-কুলুজি মুখস্থ। বোম্বের কোন্ 'তারা' কখন উঠছে, কখন ডুবছে ; বিয়ে হওয়ার পর কোন্ জুটি'র লাক আর ফেবার করছে না ; মাদ্রাজের কোন্ অভিনেতার বাঙালী মেকাপম্যান দেড় হাজার টাকা মাইনে পায় ; এখানে কার ক'খানা গাড়ী, কোন্‌টার কি নম্বর—সব তার নখদর্পণে।

সে-ই আমাকে ইদানীংকার খানকতক স্টীল ফটো এনে দেখিয়েছিল মৈনাকের, নইলে চিনতে পারতাম না।

আগেকার সে দীপ্তি বা গ্লামার কিছুই নেই।

আমি দেখেছি ওঁর দু-একখানা প্রথম দিককার ছবি, পর্দাতে ছায়া ফেললে প্রেক্ষাগৃহ যেন জ্বলে উঠত।

এখন সে উজ্জ্বল কান্তিও নেই, চোখের কোণ দুটো—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কিনা জানি না, ফোলা-ফোলা। ফলে অমন আশ্চর্য সুন্দর চোখেরও সে আকর্ষণ নেই। চুলটা তেমনই আছে অবশ্য, ঢেউ খেলানো, প্রচুর—তবে অর্ধেক চুলে পাক ধরেছে এর মধ্যেই।

বহু পুরাতন, এককালে মূল্যবান একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে উদাসদৃষ্টিতে বাজারে ঘুরেছেন লক্ষ্যহীনভাবে।

আলাপ করার দরকার নেই। আগেই করতে চেষ্টা করি নি, তার এখন।

দেখলাম, দুঃখও হলো—কিন্তু হাহুতাশ করার মতো কিছু নয়।

বেরিয়ে এসে জর্জ সাহেবের হোটেলে ঢুকলাম আবার।

এতক্ষণে নিশ্চয় ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে চন্দনের।

চন্দন আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল, যেতেই পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে বসাল।

আগেকার ভাষায় 'ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ' সমুদ্র দেখা যায় না, তবে হাওয়া আছে। চা খাবো কিনা আর একবার জিজ্ঞাসা করল। সে অবশ্য জর্জ সাহেবও করেছিলেন।

এখনও চাইলে দিতে পারবেন, আর হবে না। মেমসাহেবের বয়স হয়েছে, লাঞ্চ এর জন্য তৈরী হচ্ছেন এখন থেকেই। বারবার চা করতে গেলে ভাত হবে না।

আর কিছু দরকার নেই জানিয়ে ওরই বিছানাটায় বসলুম।

টুকরা-টাকরা দু'-একটা কথার পর ওর কি কথা আছে জিজ্ঞাসা করতে যাবো, হঠাৎ আমারই মুখ দিয়ে বেরিরে গেল, 'এবার এখানে এক সেলি-ব্রিটিকে দেখলাম হে, মানে কিছু আগের সেলিব্রিটি, মৈনাক সেন। সে দীপ্তির আর কিছুই নেই আর। তবু বোধহয় সব সিনেমা দর্শক এখনও ভোলে নি। বাঙালী ট্যুরিস্টরা টের পেলে পুলকিত হ'ত। ভদ্রলোককে যে রকম লোন্‌লি আর মুষড়ে পড়া দেখলুম—দু'চার জন লিউডো-ভক্ত গেলেও চাঙ্গা হয়ে উঠতেন!'

'মৈনাক—মানে য়্যাক্‌টর মৈনাক সেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, য়্যাক্‌টর ডিরেক্‌টর প্রোডিউসার—কী নন।

'মৈনাক সেন! এখানে!'

দেখতে খেখতে মুখ-চোখের এমন পরিবর্তন ঘটল চন্দনের ঐ ক'টা—আটটা অক্ষর উচ্চারণ করায় যে সময়টুকু বোধহয় দু'তিন সেকেণ্ডের বেশী হবে না, তার মধ্যেই ওর মুখের চিরন্তন একটা কবি-কবি আর বিনম্র মিষ্টি-ভাবের জন্যেই ও এত প্রিয় সকলের কাছে—সেই মুখ এমন কঠিন, দৃষ্টি এত কঠোর ও হিংস্র হয়ে উঠল যে, আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলুম।

কী হলো—স্ট্রোক?

ফিট?

য়্যাপোপ্লেক্‌সী?

বেশ লক্ষ্য করলুম কেমন এক নিমেষে ওর নীলাভ চোখের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা লাল পর্দা পড়ে গেল।

রগের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠল।
এ যেন এক নতুন চন্দন।
'কোথায় দেখলেন ? কখন ?'
উত্তর দিতে দেরি লাগল বৈকি !

ঠিক এ ভাবান্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না তো।
খতিয়ে খতিয়ে যেন কতকটা অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিতে দেরি লাগল বৈকি।
খতিয়ে খতিয়ে যেন কতকটা অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিলুম, 'এই তো, বাজা-রেই ঘুরছেন। এক্ষুণি দেখে এলুম। কেন বলো তো, চিনতে নাকি ? টাকা-কড়ি ধার দাওনি তো কখনও ?
এসব কথার উত্তর দিলো না, আর কোনো কথাই বললো না।
শেষের কথাগুলো কানে গেল বলেও মনে হলো না। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি যে বেকুফের মতো একা বসে রইলুম, সে কথাও মনে রইল না তার।

চন্দনের কথা

ছি, ছি, সকালে অমনভাবে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারানোটা একেবারেই উচিত হয় নি।
মাষ্টারমশাইকে ঐভাবে বসিয়ে রেখে—!
একটা কথাও বলে গেলুম না, কী অসহায় আর অপ্রস্তুত বোধ করলেন উনি !
শুনলুম, মিনিট পাঁচেক বসে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেছেন।
কী অপমানিতই না বোধ করলেন। আর কী জন্তুই না ভাবলেন আমাকে !
ছিঃ ! ওঁর কাছে মুখ দেখাবো কি করে আবার—এইটেই সারাদিন ধরে ভাবছি, কী ভাষায় মাপ চাইব ওঁর কাছে !
আসলে শিক্ষা বা ভদ্রতার মার্জনা কিছুই কিছু না।
কাঠের ওপরের পালিশের পাতলা পর্দা। যে-কোনো আবেগের তাপ বা

ব্যক্তিগত ক্ষতির আঘাত লাগলেই সেটা উঠে গিয়ে ভেতরের কর্কশ রুক্ষ কাঠটা বেরিয়ে পড়ে।

মানুষের ভেতরের আসল জন্তুটা জেগে ওঠে।

মাষ্টারমশাই অনেকটাই জানেন কিন্তু সবটা জানেন না যে।

অথচ এই কথাটাই ওঁকে বলতে চেয়েছিলুম।···কী-ই বা হলো পাগলের মতো ছুটে গিয়ে।

না পারলুম তাকে অপমান করতে, না পারলুম গালে ছুটো চড় লাগিয়ে তার নূন্যতম প্রাপ্য তাকে দিতে।

তাতে চারদিকে ভিড়ই জমে যেত, আর সে জনতা নিঃসন্দেহে ওর পক্ষ নিত।

এ প্রতিশোধ তোলার—কোনো হকই তো আমার নেই—না ন্যায়ত, না ধর্মত। বরং কথাটা বলতে গেলে আমাকেই পাগল ভাবত। 'ভিলেন অফ দি পীস' হিরো হয়ে যেত এক মিনিটে।

কিছুই করতে পারলুম না, মাঝখান থেকে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ হ'তে চলল।···

যেতে পারি এখনই, কিন্তু ওঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সামনে এসব কথা বলতে পারব না। অন্য লোকের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত—এভাবে সকলকে জানানো চলবে না।

মাপ করবেন মাষ্টারমশাই, মাপ করবেন।

জানি আপনি ক্ষমা করেছেন এতক্ষণে। চিরকালই প্রশ্রয় পেয়ে এসেছি আপনার কাছ থেকে। আপনি আর বঙ্কুবাবু চিরদিনই প্রশ্রয় দিয়েছেন। হয়ত এত প্রশ্রয় আর স্নেহ পেয়েই এমন বাঁদর তৈরী হয়েছি।

আপনাকে এ রহস্যের অনেকটাই বলেছি, তবু অনেকটা বাকীও রয়ে গেছে। সবটা যে আমিও এতদিন জানতুম না।

জানতে চাই নি বলেই সে বলে নি। নইলে মিথ্যে সে কখনও বলে না। আমার কাছে কোনোদিনই কোনো কথা গোপন করে নি।

সেও আমাকে ভালবেসেছে, তাই কোনো মিথ্যা বা গোপনতার অন্তরাল

রাখতে চায় নি আমাদের মধ্যে।

আপনি জানেন, শীলা আমার অফিসের সহকর্মী। বয়সে সামান্য একটু বড়, দেখতে চলনসই, স্বভাব মিষ্টি, ভদ্র, শান্ত মেয়ে ; ব্রাহ্মণ-কন্যা।

কিন্তু এ ছাড়াও অনেক—অনেক কথা জানবার আছে, জানাবার আছে।

আপনাকেই জানাতুম, জানিয়ে পরামর্শ নিতুম।

কিন্তু তার আগেই যে ও এই কাজ ক'রে বসল!

হ্যাঁ, সুন্দরী যাকে বলে শীলা তা নয়। আমি তা মেনে নিয়েছি।

সত্যটা পরিষ্কার থাকাই ভালো, নিজের কাছেও।

কিন্তু যদি আমার এ চোখ দুটো দিয়ে দেখতেন—আপনিও বলতেন, এমন আশ্চর্য মেয়ে আর আপনার চোখে পড়ে নি।

আর শুধু আমিই বা কেন, অমন সুন্দর অত উজ্জ্বল মানুষটাও তো ভুলেছিল।

বিবাহই হবার কথা আমাদের।

হয়েও যেত। আমি প্রস্তুত ছিলুম, বরং উৎসুক অধীর ছিলুম বলাই উচিত।

কিন্তু আমার বাবা-মা প্রথম থেকেই বেঁকে বসেছিলেন।

শীলারা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ বলে নয়—মেয়ের বয়স বেশী বলেই বেশী আপত্তি তাঁদের।

শীলার অত বয়স দেখাত না, সে স্বচ্ছন্দে কমিয়ে বলতে পারত, কিন্তু ঐ আগেই বলেছি —সে মিথ্যা কথা বলতে চাইত না, কোনো কারণেই।

বাবা বাধা দেন নি, ছেলেকে তিনি চিনতেন, কিন্তু ভেঙে পড়েছিলেন।

সে কারণটাও অতি সূক্ষ্ম। তিনি নিজেও অত বুঝতেন না বোধহয়। তাঁর যা পেনসন তাতে আমাদের সংসার চলত না—ছোট ভাই-বোন তখনও স্কুলে পড়ে—যদি তাঁরা আমাদের ত্যাগ করেন—আমার আয়টাও সেই সঙ্গে যাবে—অথচ সে আশঙ্কাটা প্রকাশ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধত।

তাতেই আরও এত মানসিক যন্ত্রণা তাঁর।

এ আশঙ্কাটাই অবশ্য অমূলক।

এ হিসেব আমরা করে ফেলেছিলাম।

আমরা যদি একত্র থাকতে না পারি—অন্তত আড়াইশো টাকা মার হাতে দেওয়া দরকার হবে। সেটা দিতে পারব নিজেরা বাসাখরচ চালিয়েও। ছ'জনের মাইনে জড়িয়ে তখনই আমাদের হাজার টাকার বেশী আয় ছিল।

আমার বাবাকে আড়াই 'শ আর শীলার বাবাকে ছ'শো দিলেও বাকী যা থাকত তাতেই কষ্ট করে চালাতে পারতুম, না হয় টিউশ্যনী নিতুম একটা।

বাধা শীলারও কিছু ছিল। ওর মার শরীর খারাপ—নার্ভাস ব্রেকডাউন গোছের একটা কি অসুখ, হঠাৎ দেখলে মাথা খারাপ বলেই মনে হ'ত, ওদের বাড়িতে মেয়ে বলতে ওর একটা ছোট বোন—তার তখন মোটে দশ বছুর বয়েস।

সংসার কে দেখে? ঝি ছিল রান্নার কিন্তু ভাড়া করা লোকের দ্বারা তো আর গৃহিণীত্ব চলে না।

তাই শীলার ইচ্ছা ছিল যে, আমার বাবা-মা যদি ওকে স্বীকার করতে বা ঘরে নিতে না চান তাহলে আলাদা বাসা না করে আমিই ওদের বাড়ি গিয়ে থাকি—অন্তত ওদের খুব কাছে কোথাও।

তাতে আমার আপত্তি ছিল।

বাবা-মাকে ছেড়ে গেলেই তাঁদের যথেষ্ট আঘাত দেওয়া হবে। তার উপর যদি ঘরজামাই হয়ে থাকি সে আঘাত হবে মর্মান্তিক—আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা—এ্যাডিং ইনসাল্ট টু ইনজুরী।

তাছাড়াও ঐ মহিলার—মানে শীলার মা'র সঙ্গে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমিও পাগল হয়ে যাবো হয়ত শেষ পর্যন্ত।

এই যৌথ কারণেই ইতস্তত করছিলাম আমরা দুজনেই : এর মধ্যেই এই কাণ্ডটা ঘটল।

আমারই দুর্মতি, সাধারণত আমরা হিন্দী বা বাংলা ছবি দেখি না, মৈনাক সেনের নাম হয়েছে বলেই—কেমন অভিনয় করে সে দেখতে একরকম

জোর করেই ওকে টেনে নিয়ে গেলুম।

এই ছবি দেখতে দেখতেই শীলা যেন পাগল হয়ে গেল।

অমন শান্ত, ভদ্র স্বভাবের স্থিরবুদ্ধি মেয়ে যেন ভূতে পাওয়ার মতো কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলল।

মৈনাক তার কাছে ভগবান হয়ে উঠল। সেকালে অনেক ভক্ত নাকি চাইত জগন্নাথের রথ তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাক—ভগবানের রথের নিচে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও তাদের সুখ।

শীলারও সেই মনোভাব কতকটা।

মৈনাক যদি ওকে লাথি মারে সেও একটা স্পর্শ বুঝবে, তাতেই ওর সুখ। তার জন্যে আত্মনাশ করাই ওর জীবনের যেন চরম সার্থকতা।

জানি না একেই স্যাডিস্ট মেণ্টালিটি বলে কি না, মোট কথা ওর তখন ধারণা বা স্বপ্ন যাই বলুন—মৈনাক সেনের জন্যে চরম কোনো স্বার্থত্যাগ বা অপরিসীম দুঃখ বরণ না করতে পারলে ওর জীবনের কোনো মূল্য নেই।

প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্ষুব্ধ, ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম।

কোনো মনোভাবই তাকে বিচলিত করল না।

অনেক বোঝাবারও চেষ্টা করলাম—নানা ভাবে নানা সময়ে, কিন্তু ফল তাতে বিপরীতই দাঁড়াল বলতে গেলে। আমার সঙ্গই তার কাছে বিষবৎ হয়ে উঠল।

আসলে কোনো যুক্তি বা কথারই কোনো অর্থ তখন তার মাথায় ঢুকছিল না, সে তখন নিজের স্বপ্নে ডুবে থাকতে চায়, নিজের অত্যুগ্র বাসনার নেশা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চায়—সেইজন্যেই কানের কাছে ভিন্ন রসের কথা বিরক্তিকর বলে বোধ হচ্ছিল।

একদিন স্পষ্টই বলে ফেলল, 'তোমার ও একঘেয়ে বকুনি আমার আর ভালো লাগছে না, দোহাই তোমার, একটু চুপ করো, আমাকেও চুপ করে থাকতে দাও।'

আত্মসম্মান জ্ঞানের তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই নিজেকে শীলার কাছ

থেকে সরিয়ে নিলাম।

তবে বোধ করি তার প্রয়োজনও ছিল না, সে-ই সরে গেল ক'দিন পরেই। অত রূপবান, খ্যাতিমান পুরুষ মৈনাক সেন সাধারণ মেয়ে শীলার মধ্যে কি দেখেছিল কে জানে—যার কাছে আসার জন্য শত শত সুন্দরী মেয়ে উৎসুক, চিত্রতারকারা তার প্রসঙ্গ পেলে ধন্য হয়ে যায়—সে একদিন শীলাকে নিয়ে সংসার পাতল।

কে জানে কোনো বিবাহের অনুষ্ঠান বা রেজিস্ট্রি হয়েছিল কিনা—তবে শাহারজাদীতে একটা ভোজ দিয়েছিল মৈনাক সেন, আর সে কথা সিনেমা পত্রিকাগুলিতে ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল।

একটু মনুষ্যত্ব ছিল বোধহয়, আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নি। তবে—সম্ভবত আমার সঙ্গ এড়াতে অথবা অনাবশ্যকবোধে চাকরিতে জবাব দিলো শীলা, এই ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

না আত্মহত্যা করি নি মাষ্টারমশাই, তাহলে তো খবরই পেতেন। যদিচ সে কারণ যথেষ্টই ছিল।

খবরের কাগজের ভাষায় 'প্রণয়িনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত' নয় তো, সোজাসুজি পরিতক্তই। ইংরেজীতে যাকে জিল্টেড বলে তাই।

এর আঘাতেই যথেষ্ট। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘরে-বাইরে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তরঙ্গ উঠল সেটা আরও মর্মান্তিক। মা বোধ করি দেওয়ালগুলো-কেই সম্বোধন করে বলতেন, 'আজকালকার ছেলেরা মনে করে তারা মায়ের পেট থেকেই বেদব্যাস হয়ে জন্মেছে, তারা সবজান্তা, বাপ-মা সব আহাম্মুক কিছু বোঝে না। ঐ তো—ওনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। তেমন মেয়ে নাকি আর ভূ-ভারতে জন্মায় নি একটিও, শান্ত, ভদ্র, কত বিবেচনা, কত বুদ্ধি—এই তো ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

এ তো সামান্য একটু নমুনামাত্র।

আরও কত কথা, কতক্ষণ ধরে চলত তা আন্দাজ করতে আপনার অসুবিধে হবে না আশা করি।

অহরহ, দিনরাত্রিই এইরকম চলত।

বাবা মধ্যে মধ্যে মাকে ধমক দিতেন কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'ত না। এত-কাল পরে এত বড় বিজয় লাভ হয়েছে—সেটা উপভোগ করবেন না?

আপিসের আক্রমণটাই বরং কম, তাদের কাজ আছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু টিটকিরি কি তামাশা—সে তত কিছু দুঃসহ নয়।

বরং কেউ কেউ বিভিন্ন কাগজে বেরুনো ওদের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক ইতিহাস দাগ দিয়ে দিয়ে টেবিলে রেখে যেত সেইটেই বেশী খারাপ লাগত।

তবে এসবই একদিন কমে এলো—জুড়িয়ে এলো বলতে গেলে।

মাও বোধ করি শ্রান্তিতেই (আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়েই আরও) চুপ করে গেলেন।

কিন্তু আমার জ্বালা জুড়লো না কিছুতেই। সত্যি বলছি মাষ্টারমশাই—ওকে যে এমন একান্তভাবে চেয়েছিলাম আগে ততটা বুঝি নি, বুঝলাম হারাবার পর।

সমস্ত জীবনটাই যেন অর্থহীন বিস্বাদ—জীবন রাখার জন্য এই যুদ্ধটাও অকারণ হয়ে উঠল।

তবু এ অনুভূতিটাই চরম নয়। তখন মনে হ'ত জীবনের চরম আঘাতটাই পাওয়া হয়ে গেছে, পরে বুঝলুম যতদিন বেঁচে থাকে মানুষ কোনো কষ্ট-দুঃখ-আঘাতই চরম বলে মনে করার কারণ নেই।

বছরখানেক পরেই খবর পেলুম। শীলা মৈনাক সেনের কাছে বাসি-ফুলের মালা হয়ে গিছল।

তাকে জীর্ণ পাদুকার মতোই ত্যাগ করে এক 'গ্ল্যামারারস' তারকার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

মনে হলো বুঝি এই ঘটনাটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

নির্লজ্জের মতোই উঠে পড়ে লাগলাম তার খবরের জন্যে, তাকে খুঁজে বার করার জন্যে।

না, বাবা-মার কাছে সে যায় নি, তাঁদের কোনো খবরও দেয় নি।

মনে হলো কোনো চেনা লোকের কাছেই যায় নি সে।

আমি কোথাও খোঁজ নিতে বাকী রাখিনি—এতদিনে তার এখানের আত্মীয়-স্বজন সকলের কথাই শুনেছি তার মুখে—এমন কি হাসনাবাদে ওদের দেশের কিছু লোক এসে বাস করছে, তাদের কথাও—তাদের সকলের সঙ্গেই দেখা করেছি যতদূর সম্ভব, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে নি। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ঐ মৈনাক সেনটার কাছেই গিছলাম একবার। এমনি খুব একটা অভদ্র ব্যবহার করে নি, রূপ ও খ্যাতির তুঙ্গে তখনও—অহঙ্কার তো একটু থাকবেই, সেটুকু মেনে নিলে কোনো অসুবিধে নেই আর। সেদিন ওকে বরং একটু অপ্রতিভও মনে হলো, হাতজোড় করে বললো,'বিশ্বাস করুন, সত্যিই বলছি আমি কোনো খবর জানি না। আমি হয়ত—মানে একটু যাকে বলে এদিক-ওদিক করেছিলুম, তাও সবটা সে কারণে নয়—কাজের চাপে আরও—সবদিন আসতে পারতুম না। তবু আমার সংসারের সে-ই কর্ত্রী ছিল তাতে তো সন্দেহ নেই, কেন চলে গেল কে জানে। আমি আপনাদের কথা শুনেছি—আমি তো ভাবছিলুম কোনো অভিমানে আপনার কাছেই চলে গেছে—'

আর কিছু বলার ছিল না তখন। পরে শুনেছিলুম, শুধু অভিমানে নয়, দৈহিক কারণেই ঘর ছাড়তে হয়েছিল শীলাকে।

একাদিক্রমে দীর্ঘদিনই আসত না মৈনাক। আর একজনকে নিয়ে স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে অন্য সংসার পেতেছিল, বাড়ীভাড়া, সংসার খরচা শীলাকে চালাতে হচ্ছিল নিজের গয়না এমন কি শেষের দিকে ভালো শাড়িগুলো বেচেও। তাইতেই নিরুপায় হয়ে গৃহত্যাগ করেছে সে।

তারপর এই দীর্ঘকাল কেটেছে।

মৈনাকের উত্থানও যেমন দেখলাম—পতনও। অতি অল্প সময় মাত্র ক'বছরের মধ্যেই উচ্চতম চূড়ায় উঠল আবার অতল গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল।

তা হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। শীলার কথাটাই আসল। এই দীর্ঘকালেও আর কোনো খবরই পেলাম না তার।

মনে হয়, সে মনের ঘেন্নায়ও বটে—নিরুপায় দিশাহারা হয়েও বটে—আত্মহত্যাই করেছে।

এই সম্ভাবনার কথাটা যখন ভাবি—তখনই মনে হয়, ঐ লোকটাই এর জন্যে দায়ী।

অমন একটা প্রাণ অকারণে অকালে নষ্ট হয়ে গেল ঐ অপদার্থ নির্বোধ বৃথা অহঙ্কারী লোকটার তুচ্ছ খেয়ালের খেসারত দিতে।

এই কথাটা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না, সব যেন চোখের সামনে লাল দেখি--স্পেনের সেই বুলফাইটের ষাঁড়ের মতো—কোনো জ্ঞান, কোনো হিসেবই থাকে না। সেইজন্যেই আপনার সঙ্গে অমন অভদ্রতাটা করতে পারলুম মাষ্টারমশাই।

লেখকের কথা

তুমি যে কেন সেদিন অমন পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা করলে চন্দন, তা কতকটা বুঝতে পারি বৈকি।

তোমার মনের অবস্থা তো জানিই—সেই জন্যেই আজ তোমাকে উদ্দেশ করে লিখতে বসেছি।

আমি জানি—তবে আমি যে জানি সেটা তুমি জান না।

শীলা মৈনাকের কাছে যাওয়ার পর তুমি যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলে সেটা আমার চোখ এড়ায় নি।

তুমি বুঝতে পারতে না—ভাবতে যে, কেউ তোমার মনোভাব বুঝবে না, তুমি সহজ আছ—কিন্তু তোমার মুখের চেহারা তোমার হুকুম মানে নি। বেদনার ছায়া তোমার ক্লান্ত চাহনিতে, অপরিসীম অবসাদে ও ললাটের অসংখ্য নবাঙ্কিত রেখায় ফুটে উঠেছিল।

তোমাকে চিরদিনই স্নেহ করি। তোমার জন্যেই আরও খবর রেখেছিলাম। অবশ্য একটা সুবিধাও জুটে গিছল খবর রাখার।

দৈবই সহায় বলতে হবে। তপু, দীপুরা তো আছেই। মাসিক আনন্দ-কল্লো-লের চিত্রসমালোচক—স্টুডিওতে পড়ে থাকা, নরেশ গুপ্ত আমার প্রতি-বেশী হয়ে এলো সেই সময়টায়।

পরিচয় ছিলই, সেটা ঝালিয়ে নিল নরেশ। মধ্যে মধ্যে কোনো একটা ছুটির

দিন সকালে চা খেতে আসত।

তার মুখেই খবর পেতাম ও জগতের। আরও শীলার খবরের জন্যেই ধৈর্য করে শুনতাম, নইলে আমার খুব একটা রুচি ছিল না ওসব খবরে। আজও নেই।

আবার আমি যে শুধু ঐ খবরটাই জানতে চাই তাও ওকে জানাতে পারি না—তৎক্ষণাৎ স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে নরেশ—কাজেই বিভিন্ন সংবাদের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো করে শীলার দুর্দশার কাহিনী সংগ্রহ করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, দুর্দশাই!

তুমি আজও শুনলে দুঃখ পাবে জানি, কিন্তু উপায় নেই।

নেশাতেই পেয়ে বসেছিল শীলাকে—প্রবল নেশা—তবে সে নেশা কাটতেও দেরী হয় নি।

মৈনাকের কাছে ওটা খেলা—কিন্তু সমাজে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ না করলে শীলা ওর অঙ্কশায়িনী হতে রাজী হবে না বলেই আলাদা বাসা করে একটা লোকদেখানো সংসার পাততে হয়েছিল।

দু'দিনের খেয়াল দু'দিনে মিটে গিয়েছিল, আর যাওয়াই তো স্বাভাবিক, অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে যার জন্যে পাগল, সে একটা সাধারণ মিষ্টি চেহারার মেয়েকে নিয়ে তৃপ্ত থাকবে—এমনটা আশা করাই তো ভুল হয়েছিল শীলার।

সে ভুলের কঠোর শাস্তি পেতে হলো।

সর্বনাশে মূল্য শোধ হ'লো তার।

তবু দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল সেই অপমান। শেষে আর পারল না। একদিন একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল। বস্ত্র বিশেষ আর ছিলও না অবশ্য, গহনা তো নয়ই। শুধু—তুমি যে তাকে অনেকদিন আগে এক জন্ম-দিনে একটা হাতঘড়ি উপহার দিয়েছিলে, সেটা সে সহস্র দুঃখেও বেচে নি। সেইটেই সম্বল করে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য সে না বেরোলে দু'-চার দিনের মধ্যেই বাড়িওলা আদালতের পেয়াদা এনে বার করে দিত।

ততদিনে দেড় বছরের ভাড়া বাকী পড়েছিল।

বোধহয় মরতেই চেয়েছিল শীলা।

ঠিক জানি না, নিশ্চয় করে বলতে পারব না। হয়ত বেরিয়ে এসে মুহূর্তেকের মায়া হয়েছিল জীবনটার প্রতি—অনেক ভেবে খুঁজে খুঁজে—এক বাল্যবন্ধুর বাড়ি এসে উঠেছিল।

ভাববার প্রয়োজন ছিল বৈকি, এ অবস্থায় কারও সংসারে এসে ওঠা যায় না ; লজ্জা তো বটেই—বাঞ্ছনার সম্ভাবনাও কম থাকত না।

এ বন্ধুটি অবিবাহিতা, ভালো চাকরি করে, তার আত্মীয়রা থাকে রায়গঞ্জে, এখানে ট্যাংরায় সে একটা সরকারী সিংগ্‌ল্ রুম ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে।

ঐ পাড়ায় দীপুরা থাকে—তাদের মুখেই বিস্তৃত খবর পেয়েছি সব।

এই বন্ধুটি—রচনা নাম বুঝি—সে ওর খবর রাখত।

তার কাছে এসেই বাবা-মা'র খবর পেল। বাবা নানা অসুখে শয্যাশায়ী—একটা স্ট্রোকের পর আর উঠতে পারেন নি। মা তো বহুদিনই অথর্ব। ছোট ভাই একটা চাকরি পেয়েছে বটে, তবে সে নাগাল্যাণ্ডে—সেখানের খরচ চালিয়ে মাকে একশো টাকার বেশী পাঠাতে পারে না। সে টাকা আর বাবার পেনসেনের টাকায় নুন ভাত যদি বা হয়—চিকিৎসা করানো চলে না।

মেয়েদের দায়িত্ব নেই, যিনি সন্তান উৎপাদন করেছেন সন্তান প্রতিপালন করার দায় তাঁর—তার বদলে তিনি সন্তানদের কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারেন, কিন্তু দাবী করতে পারেন না।

এ সবই জানে শীলা, মৈনাকের কাছে এ ধরনের কথা সে অনেক শুনেছে—কিন্তু তার এতদিনের ধারণা এ-সব যুক্তি বিচার করতে পারল না।

গভীর অনুতাপই বোধ করল, সেই সঙ্গে একটা প্রবল অপরাধবোধ।

বন্ধুর কাছেই আশ্রয় পেয়েছিল, কাপড়-জামাও। কিন্তু চাকরি কোথাও পেল না।

সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে, সে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বয়সও নেই, নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবার।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভরসা—সেখানেও সুপারিশ না থাকলে পাওয়া যায় না।

শেষ অবধি এক গুজরাটী ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় পেল—এই শর্তে যে, তিন মাসের মধ্যে শর্টহ্যাণ্ড শিখে নিতে হবে। তাঁর পেট্রোলপাম্প থেকে কাপড়ের দোকান—অনেক ব্যবসা, কিন্তু তিনি ওকে সেক্রেটারী হিসেবে নিজের কাছেই রাখতে চান।

এটা প্রকাশ্য শর্ত, অপ্রকাশ্য শর্তটা জানা গেল পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই। প্রথমটা প্রবল ঘৃণাই বোধ হয়েছিল কিন্তু তারপর—সারারাত ধরে ভেবে বুঝল, এছাড়া গতি নেই। এভাবে দীর্ঘকাল একজনের গলগ্রহ হয়ে থাকা সম্ভব নয় ; বহুদিন ঘুরে এইটুকু কাজ পেয়েছে, মাইনে আড়াইশো টাকা খাতায়-পত্রে। (তাতেই আশ্চর্য বোধ হয়েছিল প্রথমটায়)—অপ্রকাশ্য শর্ত মেনে নিলে তিনি অপ্রকাশ্যেই আরও দুশো টাকা করে দিতে রাজী আছেন।

এ কাজ ছাড়লে আর কোথায় কী কাজ পাবে সে ?

বুঝল এবং মেনেও নিল।

কিন্তু গোলমাল বাধল অন্যত্র।

বাবা-মা ওর উপার্জনের টাকা হাত পেতে নিলেন তবে ওকে আর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্থান দিতে চাইলেন না।

মৈনাক সেনের সঙ্গে বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয়, তাছাড়া শীলারই তো অসুবিধা হবে—তাদের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হবে, সবাই টিটকিরি দেবে—সেটাই কি ও সইতে পারবে ?

এইবার বুঝল শীলা এতবড় কলকাতা শহরে ওর আপন কেউ নেই।

একজন ছাড়া অবশ্য—সে তুমি, চন্দন।

কিন্তু তোমার কাছে সে আর মুখ দেখাবে কী করে ?

অনেক ভেবে দেখল সে। কোনো এক হোটেলে বা এমনি এক ঘর ভাড়া করে থাকতে পারে, তাতে খরচ অনেক বেশী, সে সব চালিয়ে মা-বাবাকে কি দেবে ? আর এখানে নিত্য চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়—বাহ্য অন্ত-

রঙ্গতা ও আত্মীয়তার আড়ালে ব্যঙ্গবিদ্রূপের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও রসনা চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের—সকলেই 'সরল' ভাবে এ-অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সমবেদনা দেখায়।

শেষে—আবারও বোধহয় যখন আত্মহত্যার কথাটা ভাবছে—এই আশ্রয় পেয়ে গেল। ওর মনিবেরই আপন কাকা, ষাট-বাষট্টি বছর বয়স। স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে বহুদিন, এক ছেলে। সে কানাডায় থাকে। কেউ নেই সংসারে, ঝি-চাকর ভরসা। শরীর ভাঙছে, এ সময় একটু সেবা-শুশ্রূষার দরকারী তেমন কেউ আছে শীলার সন্ধানে—যে সঙ্গিনী, সেবিকারূপে তার কাছে থাকতে পারে, অবশ্য তাঁকে উনি গৃহিণীর মর্যাদাতেই গৃহে রাখতে রাজী আছেন।

প্রশ্নের মধ্যে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, না বোঝার কথা নয়।

শীলাও সে ভান করল না।

তাঁর সঙ্গে একটা বড় হোটেলে চা খেতে গিয়ে কথাবার্তা পাকা করে ফেলল।

দশ হাজার টাকা শীলা মার নামে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দেবে, ওর নিজের নামে তিনি আরও চল্লিশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দেবেন। থাকতে হবে ওঁর বাড়িতেই—ম্যাঙ্গালোরে। সেখানে প্রাসাদোপম বাড়ি; অনেক কারবার ছিল, সব গুটিয়ে ফেলেছেন—তবে এখনও তিনটে পেট্রোল পাম্প আছে, ভাড়া বাড়িও আছে ক'টা। বস্ত্র অলঙ্কার কিছুরই অভাব থাকবে না, শীলা নিজের রুচিমতো মাছ মাংসও পৃথক রাঁধিয়ে খেতে পারে। সব খরচা তো তিনি বহন করবেনই, মাসে আড়াইশো টাকা হাতখরচা দেবেন।

এফ ডি-টা করিয়ে নিল শীলা তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে আবার এমনি নিরাশ্রয় হয়ে না পড়ে এই কারণে।

নইলে, জাভেরীজী আশ্বাস দিয়েছেন, শীলা যদি তাঁর কাজ ঠিকমতো করে —তিনি তাকে একটা বাড়ি এবং ঐ পেট্রোল পাম্পগুলোর স্বত্ব লিখে

দেবেন।

দু'বছর দেখে সে ব্যবস্থা করবেন।

শীলা বেঁচে গেল। এখান থেকে সে পালাতে পারল সেইটেই বড় লাভ।

দু-তিন দিনের মধ্যেই সে চলে গেল। জাভেরীজীর সঙ্গে।

সেখানেই আছে সে তাঁর আশ্রয়ে। কোনো অসুবিধা নেই। বাবাকে মাসে দু'শো টাকা করে পাঠায়।

সুখে আছে কিনা জানি না—নিশ্চিন্ত হয়েছে সেটা বুঝতে পারি।

না চন্দন, এ কথা বলি নি তোমাকে?

বলা যাবে না।

তার খবর জানলে হয়ত তুমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসবে, হয়ত তাকে বিয়ে করবে—সেও হয়ত রাজী হয়ে যাবে। ঘরকন্না-সন্তানের মোহ মেয়েদের যায় না কোনোদিনই—কিন্তু তারপর।

সে জগদ্দল শীলা তুমি বইতে পারবে?···

শুধু সংসার চালানোর কথা বলছি না—সমাজ বলে একটা জিনিস আছে, আত্মীয় পরিচিতদের সমাজ। আজকাল কেউ ধোপা-নাপিত বন্ধ করে 'একঘরে' করতে পারে না—কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে নিজেদের সঙ্কুচিত নির্বান্ধব করে নিতে হয়—বাধ্য হয়ে।

ধনীদের হয়ত হয় না—তোমার আমার মতো মধ্যবিত্তদের হয়।

তার চেয়ে এই ভালো। প্রেমের যে স্বর্গ নিজের মনে রচনা করেছে। তাতে বেদনাও যেমন আছে, তেমনি সুখও কিছু আছে।

অন্তত বাস্তবের রূঢ়তা বা গ্লানি তো নেই।

